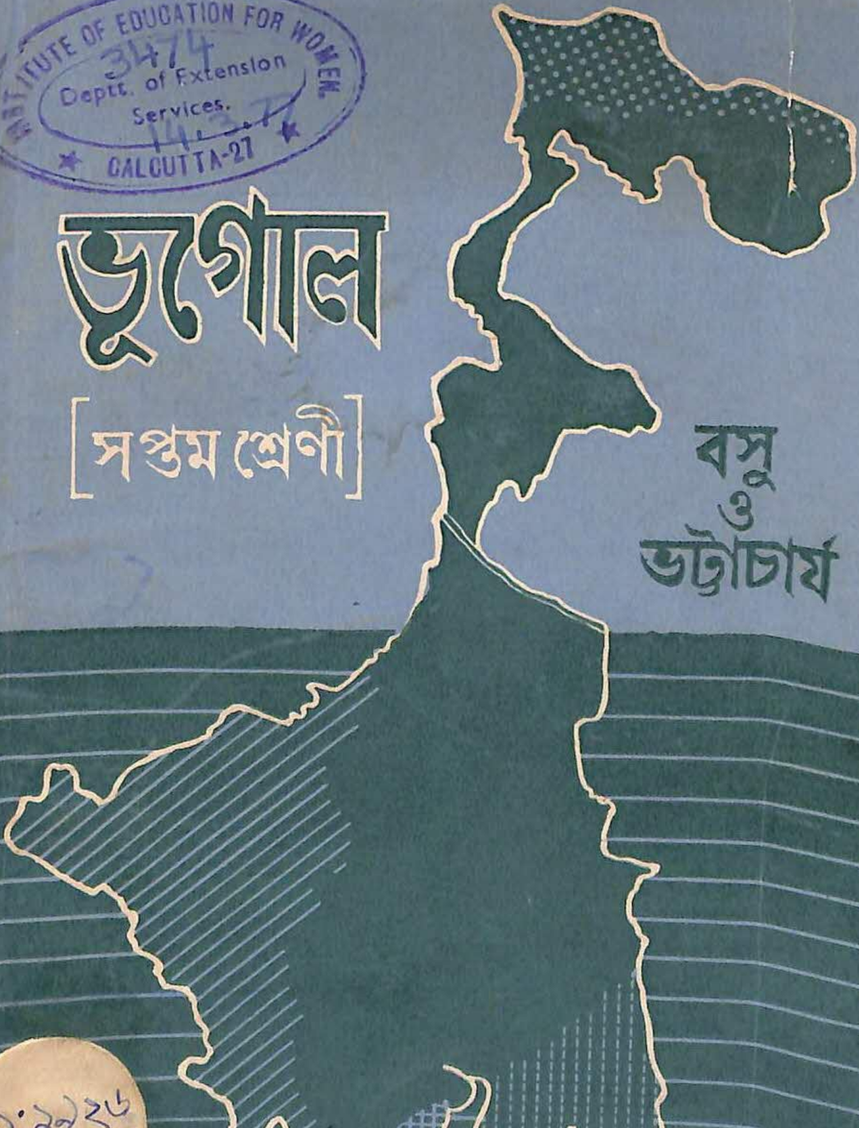
ভূগোল

[সপ্তম শ্রেণী]



বসু
ও
ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক আমূল পরিবর্তিত ও অনুমোদিত
সিলেবাস অনুসারে **সপ্তম শ্রেণীর** জন্য লিখিত।

[Vide Board's Curriculum & Syllabus Vol. I, August, 1973 & Notification No. Syll/PN/1/74, dated 19.6.74]

ভূগোল

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

অধ্যক্ষ কুমারেশ বসু
দমদম মতিঝিল ইভ্‌নিং কলেজ অব কমার্স
ও
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ক্ষুদিরাম বসু সেণ্ট্রাল কলেজ, কলিকাতা

ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

SYLLABUS FOR CLASS VII

1. Situation of West Bengal in relation to the neighbouring States and Countries. .. (2 Pages)

2. A Geographical study of the following areas of West Bengal :

   The Mountainous tracts of Jalpaiguri and Darjeeling, the Western Plateau area, the Northern and Southern plains, the Sundarbans and the coastal dune tracts of Midnapore. The divisions mentioned above should be explained with the help of a Map of Districts of the State. ... (20 Pages)

3. The development plans of West Bengal with brief reference to irrigation, flood control, development of communications, industries and trade. (28 Pages)

প্রথম অধ্যায়

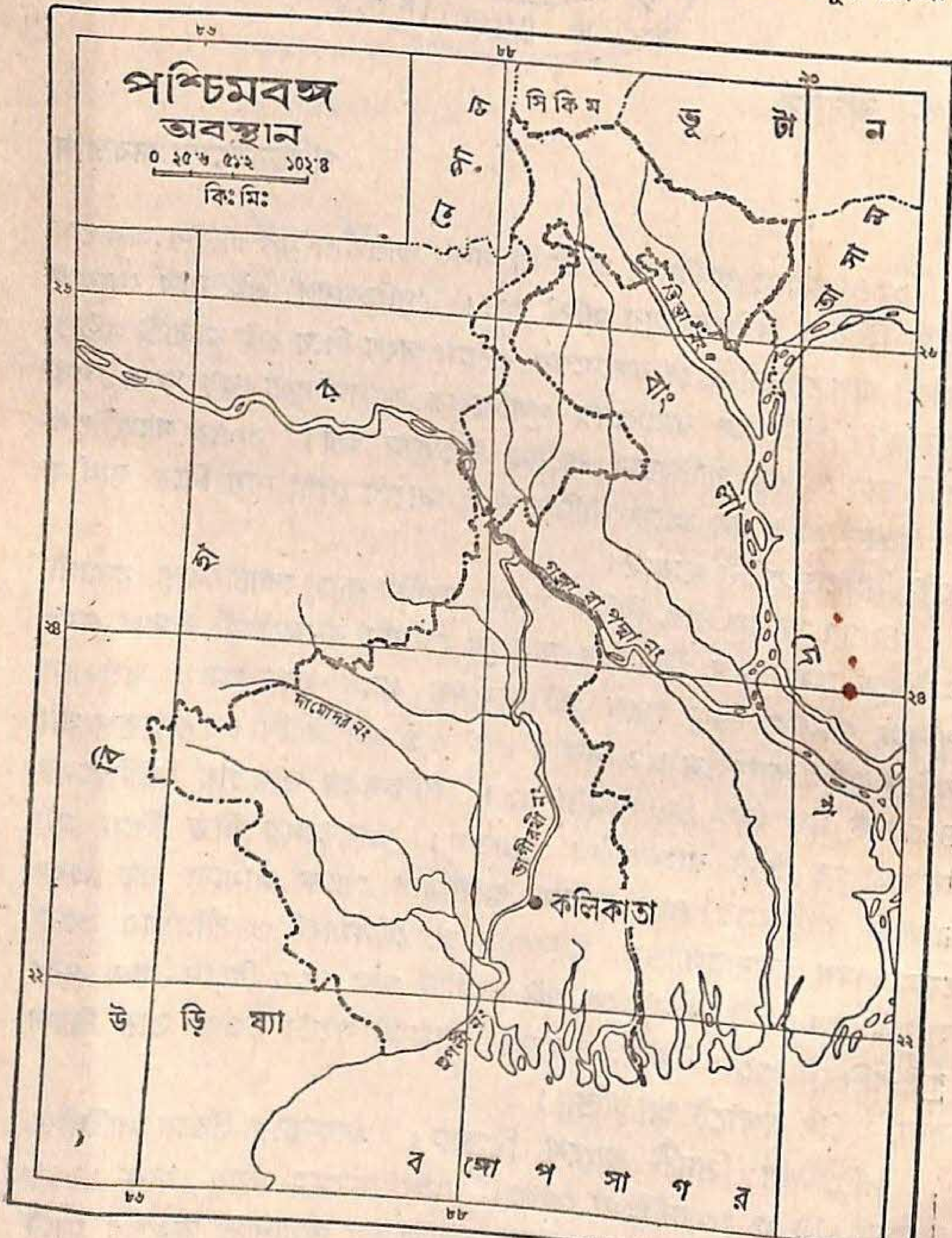
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ' এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে অবিভক্ত বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছে। অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূবদিকের অপেক্ষাকৃত বড় অংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বাংলা দেশ' নাম নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পরে, বিভিন্ন সময়ে, দেশীয় রাজ্য কোচবিহার, ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর, বিহারের মানভূম জেলার বাংলাভাষী অঞ্চল এবং পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭ হাজার ৮শ' ৫৩ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার ১১। পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় ইউনিয়নের অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্যগুলির অন্যতম। আয়তনের দিক দিয়ে এই রাজ্যটি পর্তুগালের প্রায় সমান, অস্ট্রিয়ার থেকে সামান্য বড় এবং বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও শ্রীলঙ্কার থেকে অনেক বড়। উত্তর-দক্ষিণে এই রাজ্যটি প্রায় ৬০০ কি.মি. লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ কি.মি. চওড়া। রাজ্যটি যতটা চওড়া তার দ্বিগুণ লম্বা, অর্থাৎ লম্বাটে আকৃতির।

পশ্চিমবঙ্গ তিনটি অংশে বিভক্ত। একেবারে উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা। দেশবিভাগের সময় থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত উত্তরের এই অংশটি পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অংশের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলেই

সরু এক ফালি জমির দ্বারা রাজ্যের উত্তর অংশের সাথে অবশিষ্ট অংশের সরাসরি সংযোগ ঘটে। মাঝখানে মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।



মধ্যের এই অংশটি রাজ্যের দক্ষিণ অংশের থেকে গঙ্গা-পদ্মা নদীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সম্প্রতি ফরাক্কার কাছে গঙ্গানদীর উপর সেতু নির্মাণ করে

রাজ্যের দক্ষিণ অংশের সঙ্গে মধ্য ও উত্তর অংশের সংযোগসাধন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রধান ও বড় অংশটি গঙ্গা-পদ্মার দক্ষিণে অবস্থিত। এই অংশটি গঙ্গানদীর ব-দ্বীপের পশ্চিম অংশ এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পূর্বের শেষ প্রান্ত নিয়ে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশ স্বাধীনতালাভের পর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায়, রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্ব অংশে অবস্থিত। ২১° ৩৮′ থেকে ২৭°১০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫°৫০′ থেকে ৮৯°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে এই রাজ্যটি অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের মাঝ বরাবর পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার ভিতর দিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ ক্রান্তীয় মণ্ডলের বাইরে অবস্থিত হলেও সমগ্রভাবে এই রাজ্যটি ক্রান্তীয় মৌসুমী বলয়ের অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও জীবনধারার উপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অপরিসীম।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূবে আসাম ও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে নেপাল, বিহার ও উড়িষ্যা। সিকিম ও ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা ছুরির ফলার মত পশ্চিম-বঙ্গের উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি চলে এসেছে। উত্তরে নেপাল ও ভুটান এবং পূবে বাংলাদেশের সঙ্গে এই রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় এবং চীনের সীমান্তের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের পূবদিকে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচল, নাগাভূমি, মণিপুর ও মিজোরাম এবং এই রাজ্যের পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা। আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ভিতর দিয়ে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। মাত্র ১৫ কি.মি. চওড়া নক্সালবাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই সংযোগ রক্ষার কাজ চলে। নক্সালবাড়ির একদিকে রয়েছে নেপাল ও অন্যদিকে বাংলা-দেশ।

উত্তর দাও

১. পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত? এই রাজ্যে কত লোক বাস করে?
২. পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ও সীমা বর্ণনা কর।
৩. এই রাজ্যের প্রতিবেশী স্বাধীন দেশগুলির নাম কর।
৪. পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানের কোন রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব আছে কি?
৫. এই রাজ্যের জলবায়ুর উপর অবস্থান কি প্রভাব বিস্তার করেছে?
৬. একটি মানচিত্র এঁকে পশ্চিমবঙ্গের সীমা নির্দেশ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভৌগোলিক বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ প্রধানতঃ একঘেয়ে পলিগঠিত সমতলভূমি। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত। পশ্চিম সীমানা বরাবর ছোটনাগপুরের মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ রাজ্যের মোট আয়তনের শতকরা ৬ ভাগ জুড়ে রয়েছে। একেবারে উত্তরে এই রাজ্যের আয়তনের শতকরা ১ ভাগ মাত্র পর্বতময়।

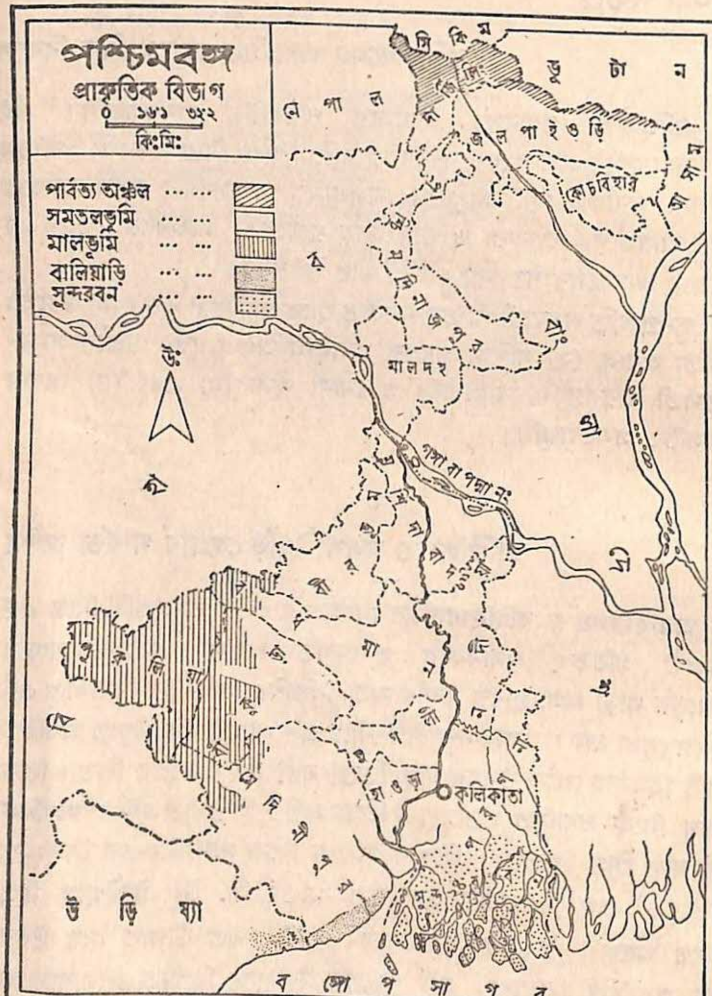
ভু-প্রকৃতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) পশ্চিম প্রান্তের মালভূমি অঞ্চল, (৩) দক্ষিণে সমুদ্র-তীরবর্তী অরণ্যভূমি, বালিয়াড়ি ও নোনা জলাভূমি, এবং (৪) মধ্যের পলিগঠিত সমতলভূমি।

১

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চল

অন্তর্হিমালয় ও বহির্হিমালয়ের গিরিশ্রেণী ও উপত্যকাগুলি নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। এখানকার ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো। পাহাড়ের খাড়া ঢাল, ছুরির ফলার মত পর্বতশিরা ও গভীর গিরিখাত এই অঞ্চলে দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার নীচে প্রায় ৬৪৬২ মি. উঁচুতে অবস্থিত একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে **তিস্তা নদী** এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তিস্তা নদীর গিরিখাত এই অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। তিস্তার পশ্চিম দিকে দার্জিলিং-এর শৈলমালা অবস্থিত। এই শৈলমালার কেন্দ্রস্থলে ২৫৬৭ মি. উঁচু **টাইগার হিল** দাঁড়িয়ে আছে। টাইগার হিল থেকে একটি পর্বত উদ্গত হয়ে উত্তর দিকে প্রসারিত হয়েছে। এই পর্বতের উপরেই বিখ্যাত শৈলাবাস ও পর্যটনকেন্দ্র **দার্জিলিং** শহর গড়ে উঠেছে। টাইগার হিল থেকে উদ্গত হয়ে **ডাউ হিল** নামে আর একটি পাহাড় দক্ষিণদিকে নেমে এসে ক্রমে সমতলভূমির সাথে মিশেছে। এই ডাউ হিলের উপর **কার্শিয়াং** শহর

অবস্থিত। তাকদা নামে আর একটি পাহাড় পূবদিকে প্রসারিত রয়েছে। মংপুর বিখ্যাত সিঙ্কোনা বাগানগুলি তাকদা পাহাড়ের উপর অবস্থিত।



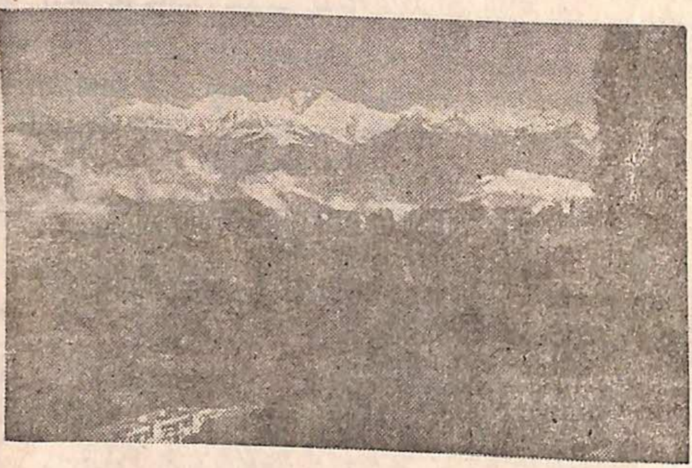
টাইগার হিল থেকে একটি পর্বত উদ্‌গত হয়ে ঘুম ও সুকিয়া পোখরির ভিতর দিয়ে পশ্চিমদিকে নেপাল সীমান্তে অবস্থিত সীমানাবস্তি পর্যন্ত

চলে গেছে। এই পাহাড়টি **ঘুম পাহাড়** নামে পরিচিত। সীমানাবস্তির ভিতর দিয়ে আর একটি পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে। দক্ষিণ-দিকে এই পাহাড়টি মিরিকের ভিতর দিয়ে সমতলভূমি পর্যন্ত চলে গেছে। এই পাহাড়ের একদিকে ভারত-নেপাল সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত মেচি নদীর উপত্যকা এবং আর এক দিকে বালাসন নদীর উপত্যকা। এই পাহাড়টি উত্তর দিকে খাড়াভাবে উঁচু হয়ে অগ্রসর হতে হতে ৩০০০ মিটারেরও বেশী উঁচু টংলু পর্যন্ত গেছে। সেখান থেকে **সিঙ্গলিলা পর্বত** নাম নিয়ে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে। সিঙ্গলিলার তিনটি শৃঙ্গ



উল্লেখযোগ্য ঃ দার্জিলিং ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত **সন্দকফু** (৩৩২৩ মি.) এবং দার্জিলিং, সিকিম ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত **ফালুট** (৩৫৯৬ মি.) ও **সিঙ্গলিলা** (৩৬৭৯ মি.)। নেপাল ও সিকিমের সীমান্ত দিয়ে আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে এই পর্বতমালা সিকিম, নেপাল ও তিব্বতের সংযোগস্থলে সুবিখ্যাত **কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে** গিয়ে শেষ হয়েছে। কাঞ্চন-জঙ্ঘার উচ্চতা ৮৫৯৮ মি.।

তিস্তা গিরিখাতের পূবদিকে ডুরবিন দারা পর্বত অবস্থিত। এই পাহাড়ের উচ্চতা ১৮০০ মি.। কালিম্পং শহর এখানে অবস্থিত। কালিম্পং থেকে জেলেপ লা গিরিপথের মধ্য দিয়ে তিব্বতে যাওয়ার রাস্তা



কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোরম দৃশ্য

আছে। আগে এই পথে পশমের ব্যবসা চলত। তিব্বতে চীনের শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে ঐ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের সর্বপ্রধান নদী তিস্তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই অঞ্চলে তিস্তা অত্যন্ত খরস্রোতা। বড় রঙ্গিত সিকিমে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং ও কালিম্পং মহকুমার সংযোগস্থলে তিস্তার সাথে মিলিত হয়েছে। রিল্লি, রঙ্গপো, রেয়াং, শিভক প্রভৃতি তিস্তার অন্যান্য উপনদী। মেচি নদী পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং জেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। জলঢাকা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, সঙ্কোশ প্রভৃতি নদী ভূটানের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। কার্সিয়াং-এর কয়েক কিলোমিটার পূবে একটি উপত্যকায় জন্ম নিয়ে মহানন্দা নদী দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমায় সমভূমিতে প্রবেশ করেছে।

অনেকগুলো পার্বত্য নদী মহানন্দার সাথে মিলিত হয়ে এর জলধারাকে পুষ্ট করেছে। এইসব নদীর মধ্যে বালাসন উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলি খরস্রোতা। নৌচলাচলের পক্ষে এই সব নদী উপযোগী না হলেও, বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ এই নদীগুলি থেকে উৎপাদন করা যেতে পারে। জলসেচের কাজেও এই নদীগুলিকে লাগানো যায়। জলঢাকা নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় নদী তিস্তা। তিস্তা নদীতে বন্যার ফলে মাঝে মাঝে ভীষণ ক্ষতি হয়। এই নদীটিকে নিয়ন্ত্রণ করে বন্যারোধ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, যাতায়াতের উন্নতি প্রভৃতি উপকার পাওয়া যেতে পারে। উত্তরবঙ্গ শিল্পে খুব পিছিয়ে আছে। পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এখানকার শিল্পোন্নতির দরজা খুলে দেওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন রকমের মাটি দেখা যায়। ১০০০—১৫০০ মি. উচ্চতায় মাটি জৈবসারে পূর্ণ। কিন্তু খাড়া ঢালের জন্য মাটি নীচের দিকে নেমে যায়। অবিবেচকের মত পাহাড়ের গায়ের গাছপালা কেটে ফেলায় মাটির উপরে কোন আচ্ছাদন থাকে না। তার উপর বেশী বৃষ্টি পড়ার ফলে প্রায়ই ধস নামে। ১৫০০--৩০০০ মি. উঁচু অঞ্চলে উৎকৃষ্ট বাদামি রঙের মাটি দেখা যায়। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় মাটি পচা উদ্ভিজ্জ পদার্থে পূর্ণ ও কালো রঙের হয়। আরও উঁচুতে সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলে মাটি অম্ল-ধর্মী। এই মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। কৃষির পক্ষে এই রকম মাটি বিশেষ উপযোগী নয়। পার্বত্য অঞ্চলে ১০০০ মিটারের থেকে নীচু অঞ্চলের মাটিও জৈবসারে পূর্ণ। পার্বত্য অঞ্চলের মাটিতে নুড়ি ও পাথর মিশানো থাকে। এই রকম মাটিকে পাথুরে মাটি বলে। এই মাটি অত্যন্ত শক্ত ও চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক। নদীতীরের মাটিতে নুড়ি ও পাথরের সঙ্গে বালিও মিশানো থাকে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলের অনেক জায়গায় বেহিসেবীভাবে গাছপালা কেটে ফেলায় এবং অতিরিক্ত পশুচারণ করায় ভূমিক্ষয় দেখা দিয়েছে। ঐসব জায়গায় নতুন বনভূমি রচনা করে ও পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্তিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের **বনভূমির** মোট আয়তনের শতকরা ৮ ভাগ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন রকমের গাছ দেখা যায়। (ক) ৯০০ মি. পর্যন্ত উঁচু অঞ্চলে শাল, তুন, পাকাসাজ, চিলনি, পানিসাজ, গোকুল, শিমুল, গামারি, কদম, নাগেশ্বর, খয়ের, তেজপাতা, পাইন, বাঁশ প্রভৃতি জাতের গাছ দেখা যায়। (খ) ৯০০--২০০০ মি. উচ্চতার মধ্যে উটিস, আখরোট, বার্চ, পিপলি, ওক, বাদাম, চিলনি, শিরিশ, পানিসাজ, বাঁশ প্রভৃতি জাতের গাছ জন্মে। (গ) ২০০০--৩০০০ মি. উচ্চতায় ওক, বাদাম, জয়পত্র, ম্যাপল, কাপাসি, খারানি, বাক, ফালাত, কাটুস প্রভৃতি জাতের গাছ দেখা যায়। (ঘ) ৩ হাজার মিটারের উপরে সরলবর্গীয় ও রোডোডেনড্রনের বন দেখা যায়। সরলবর্গীয় গাছের মধ্যে টকসাস, হেমলক, টেংরে সালা, সিলভার ফার, গোবরে সালা, বার্চ প্রভৃতি জাতের নাম করা যেতে পারে।

দার্জিলিং ও কার্সিয়াং-এর আশেপাশে চা বাগান তৈরি করার জন্য অনেক বন কেটে ফেলা হয়েছে। ডাউ হিল ও টাইগার হিল-এ দেওদারের ঘন বন দেখা যায়। ঘুম পাহাড়ে ওকগাছ বেশী দেখা যায়, আর দার্জিলিং-এর চারপাশে বার্চ গাছের ছড়াছড়ি। কালিম্পং-এর চারধারে ওক ও ম্যাগনোলিয়া বেশী জন্মে।

আগেই বলা হয়েছে, টাইগার হিল থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত পর্বত-শিরার উপর **দার্জিলিং** শহর অবস্থিত। শহরটি প্রধানতঃ পাহাড়ের পশ্চিমদিকের ঢালে গড়ে উঠেছে। দার্জিলিং পাহাড়, ঘুম পাহাড় ও সিঙ্গলিলা পাহাড়ের মাঝখানে একটি গভীর গিরিখাত আছে। এই গিরিখাতের মধ্যে কাগঝোরা ও অন্যান্য ছোট পার্বত্য নদী থেকে **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন** করা হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাটি ছিদ্রপং-এ অবস্থিত। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দার্জিলিং-এ ব্যবহার করা হয়। গিরিখাতের ঢালে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা-এর চাষ করা হয়। এখানকার চা স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবী বিখ্যাত।

দার্জিলিং-এর দক্ষিণে **কার্সিয়াং** এবং তিস্তা নদীর পূবদিকে অবস্থিত **কালিম্পং** শহর দুটিও স্বাস্থ্যনিবাস ও পর্যটন কেন্দ্র।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে চা, আলু ও কাঠ প্রধান **উৎপন্ন দ্রব্য**। এই

অঞ্চলের **চা** দেশের মধ্যে ও বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিম থেকে প্রচুর পরিমাণে **আলু** ও **আলুর বীজ** সমতলে রপ্তানি হয়। এই অঞ্চল অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ। যাতায়াতের ব্যবস্থা খারাপ বলে এই সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায় না। এই অঞ্চলে বাঁধাকপি, ফুলকপি, মটর, স্কোয়াশ প্রভৃতি **শাকসব্জি** উৎপন্ন হয়। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ ভালজাতের কমলালেবু, মংপুতে **সিঙ্কোনা** ও অন্যান্য ভেষজগুল্মের চাষ হয়। এই অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে গুটি-পোকার চাষ ও রেশম উৎপাদন করা হয়। মংপুতে একটি কুইনিন তৈরির কারখানা আছে।

যাতায়াতের অসুবিধা ও শক্তির অভাব এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

২

পশ্চিমপ্রান্তের মালভূমি অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তের এই প্রাকৃতিক বিভাগটি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিম অংশ এবং গোটা পুরুলিয়া জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে। মালভূমি প্রকৃতির ঢেউখেলানো উঁচুনীচু জমি, মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পাহাড়, ফাঁকা ফাঁকা শাল, পলাশ ও মহুয়ার জঙ্গল, রুক্ষ কাঁকুরে মাটি ও শুক্‌নো জলবায়ু এই অঞ্চলটিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই অঞ্চলটি আসলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিরই সম্প্রসারিত অংশ।

পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম অংশে একদিকে সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকা ও অন্যদিকে কংসাবতী বা কাঁসাই নদী, এই দু'য়ের মাঝখানে **অযোধ্যা পাহাড়** অবস্থিত। এই পাহাড়টি ২০ কি.মি. লম্বা ও ১০ কি.মি. চওড়া। অযোধ্যা পাহাড় পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গোর্গাবুরুর (গজবুরু) উচ্চতা ৬৭৭ মি.। পুরুলিয়া জেলার উত্তরপূর্ব প্রান্তে **পাঞ্চেত পাহাড়** দাঁড়িয়ে আছে। **দামোদর নদ** এই পাহাড়ের কোল ঘেসে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পাঞ্চেত পাহাড় ৬৪৩ মি. উঁচু। এই পাহাড়ের

গায়ে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধ ও জলাধার (পাঞ্চেত বাঁধ) নির্মাণ করা হয়েছে। অযোধ্যা পাহাড় ও পাঞ্চেত পাহাড় বাদ



দিয়ে পুরুলিয়ার অবশিষ্ট অংশ ১০০—৩০০ মি. উঁচু এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। কংসাবতী ও তার উপনদী-গুলি পুরুলিয়ার মালভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কুমারী কংসাবতীর প্রধান উপনদী। কংসাবতীর কয়েকটি উপনদী অযোধ্যা

পাহাড়ে উৎপন্ন হয়েছে। **শিলাই** ও **দ্বারকেশ্বর** নদী পুরুলিয়ার উচ্চ-ভূমির পূর্ব অংশে উৎপন্ন হয়ে কিছু পথ পুরুলিয়া জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। পুরুলিয়ার পূর্ব অংশে ২০০-৩০০ মি. উঁচু কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলে **লাল রঙের মাটি** দেখা যায়। পুরুলিয়ার দক্ষিণ অংশের উঁচুনীচু জমি ক্রমে মেদিনীপুর জেলায় এসে মিশেছে। এই অঞ্চলের উচ্চতা ১০০ মিটারের কম। এখানে ভূপৃষ্ঠ শক্ত **কাঁকুরে-মাটিতে** ঢাকা।

পুরুলিয়ার মালভূমি পূবদিকে বাঁকুড়া জেলায় এসে মিশেছে। বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে উঁচু অংশ **শুশুনিয়া পাহাড়**। এই পাহাড়ের উচ্চতা ৪৪০ মি.। এই পাহাড়ের চারদিকে পার্বত্য উচ্চভূমি বেশ কিছু-দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বাঁকুড়া জেলার উত্তর সীমানা দিয়ে দামোদর নদ প্রবাহিত হয়েছে। দামোদরের দক্ষিণে **শালি নদী** এই জেলার উত্তর অংশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দামোদরের সাথে মিলিত হয়েছে। শালি নদীর অববাহিকার উত্তর অংশের ভূপ্রকৃতি উঁচুনীচু—কোথাও জঙ্গলে ঢাকা উঁচু ঢিবি, আবার কোথাও পলিগঠিত সমতলভূমি। গঙ্গা-জলঘাটি থেকে উত্তর দিকে দামোদর নদ পর্যন্ত অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পাহাড় ও ক্ষয়িভূত শিলাখণ্ড দেখা যায়। পূবদিকে সোনা-মুখী ছাড়িয়ে অল্প উঁচুনীচু জমি **কাঁকুরে মাটিতে** ঢাকা।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ মালভূমির অন্তর্গত হলেও এখানকার ভূমির গঠন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার ভূমির গঠন থেকে আলাদা। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় মালভূমি প্রধানতঃ কেলাসিত শিলার দ্বারা গঠিত। কিন্তু বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশের ভূমি গণ্ডোয়ানা যুগের বেলেপাথর, কয়লা ও শ্লেটের মত পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলটি কয়লাসম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। **রাণীগঞ্জ** ভারতের অন্যতম প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল।

অজয় নদ বিহারের মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং দীর্ঘপথ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সবশেষে বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়ে এসে ভাগীরথী নদীতে পড়েছে। অজয়ের দক্ষিণে এর উপনদী কুনুর বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়ে বয়ে

গেছে। এখানকার **মাটি** ভীষণভাবে ক্ষয়ীভূত ও কাঁকুরে। কাছেই ৭০ কি.মি. উঁচু জঙ্গলে ঢাকা একটা ঢিবি দেখা যায়। এই ঢিবির নাম ভালকি। অজয়ের উত্তরে মালভূমির প্রান্তসীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে ক্রমে ক্রমে গঙ্গার তীর পর্যন্ত এসেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার একেবারে উত্তর সীমায় ফরাক্কার কাছে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। এই সব পাহাড় বেসাল্ট পাথরে তৈরি।

ময়ূরাক্ষী নদী এবং তার উত্তর দিকের উপনদী ব্রাহ্মণী ও দ্বারকা এবং দক্ষিণ দিকের উপনদী কোপাই ও বক্রেশ্বর বীরভূম জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই অঞ্চলেও জায়গায় জায়গায় মাটি ক্ষয়ীভূত হয়েছে। বিহারের **ম্যাসাঞ্জোরে** ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভূমিক্ষয় নিবারণের ব্যবস্থা হয়েছে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে পুরুলিয়া জেলা এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল প্রধানতঃ **লাল রঙের কাঁকুরে মাটিতে** ঢাকা। এই মাটির উর্বরা শক্তি মাঝারি রকমের। ঠিকমত সেচ ও সার দিলে এই মাটিতে ভাল ফসল ফলানো যায়। এই অঞ্চলে বনজঙ্গল কেটে ফেলায় সাংঘাতিক ভূমিক্ষয় দেখা দিয়েছে। মালভূমি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত বরাবর পুরানো পলিমাটি দেখা যায়। এই মাটির উর্বরাশক্তি নতুন পলি থেকে কম। অবশ্য, সার দিলে এই মাটিতেও ভাল ফসল ফলে।

মালভূমি অঞ্চলের **জলবায়ু** পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে শুক্‌নো। শীত ও গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত আসানসোলে গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী। এই অঞ্চলে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৪০ সে.মি.'র কম। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে **মৌসুমী পাতাঝরা গাছের বন** দেখা যায়। এই বনে শাল, পলাশ, হলদু, হারা, শিমুল, মহুয়া ও কুল গাছ জন্মে। এই সব গাছের সব পাতা শীতের শেষে এক সঙ্গে ঝরে যায় বলে এদের পর্ণমোচী বা পাতাঝরা গাছ বলে। মহুয়ার ফল ও বীচি থেকে মদ ও তেল প্রস্তুত হয়। শাল, পলাশ ও কুল গাছে লাক্ষা কীট

পালন করা হয়। এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও বাঁশ ও সাবাই জাতীয় লম্বা ঘাস জন্মে।

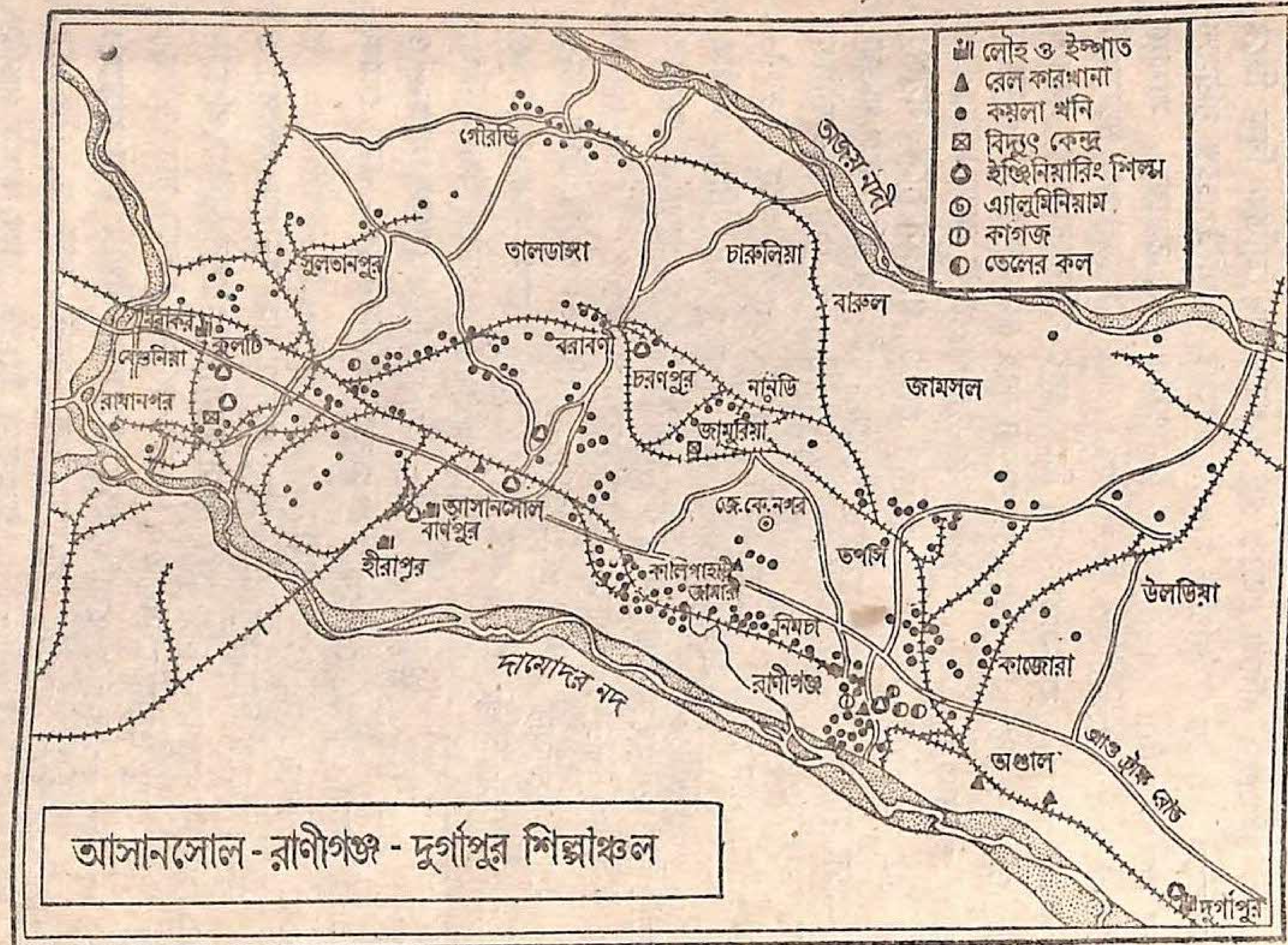
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের এই অঞ্চলটি **অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত।** মাটির উর্বরাশক্তি মাঝারি রকমের ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ায় কৃষির ফলনও কম। ধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। সামান্য পরিমাণ গম ও তৈলবীজও উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে লাক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। কলকাতা বন্দর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি হয়। ইদানীং জলসেচের ব্যবস্থা করে এই অঞ্চলে কৃষির ফলন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। পশুপালনেও উন্নতির চেষ্টা চলছে।

এই অঞ্চলটি কৃষিতে পশ্চাৎপদ হলেও **খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ।** ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের চার ভাগের এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় এবং এই রাজ্যের প্রায় সমস্ত কয়লা মালভূমি অঞ্চলে উত্তোলিত হয়। বর্ধমান জেলায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কয়লাখনি আছে। রাণী-গঞ্জ, আসানসোল, দিশেরগড়, রামনগর, সালানপুর, জামুরিয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি। কয়লা ছাড়া এই অঞ্চলে চীনামাটি, উলফ্রাম, ফায়ার ক্লে, ও নানারকম পাথরও পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রধানতঃ খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে নানাবিধ **শিল্প** গড়ে উঠেছে। এই সব শিল্পের মধ্যে লোহা ও ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, সার উৎপাদন শিল্প, বাইসাইকেল শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কাগজ শিল্প, রেলের ইঞ্জিন ও ওয়াগন নির্মাণ শিল্প, টেলিফোনের কেব্‌ল্ উৎপাদন শিল্প এবং কোক কয়লা উৎপাদন শিল্প উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে আসানসোল, বার্নপুর, দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। **আসানসোল-দুর্গাপুর** অঞ্চল পশ্চিম-বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠছে। এই অঞ্চলে অনেকগুলি তাপবিদ্যুতের কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদিতে একটা বড় তাপবিদ্যুতের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এই অঞ্চলে সিমেন্ট, লোহা, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের উন্নতির প্রচুর সুযোগ সুবিধা আছে।

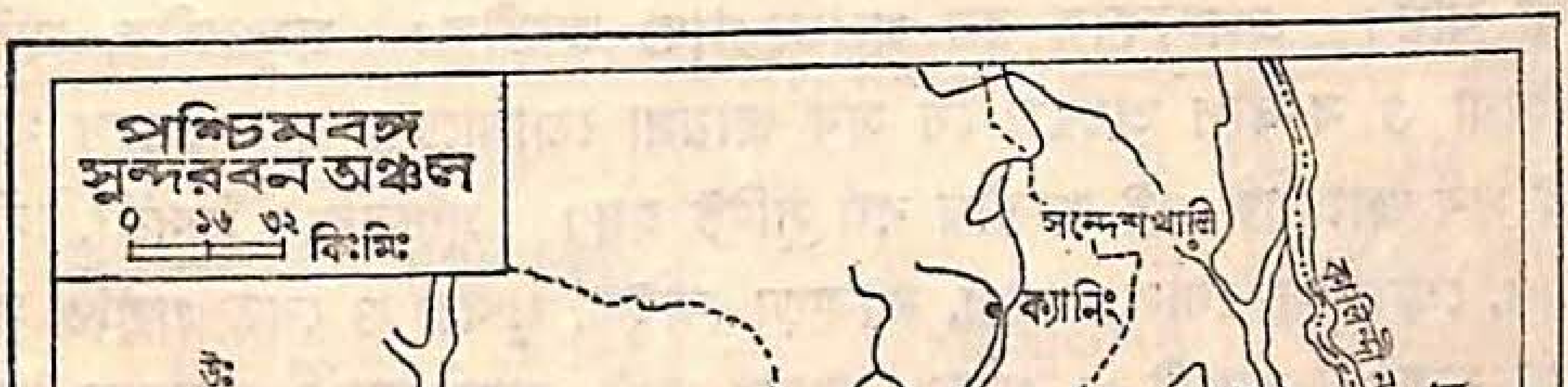
বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় নানারকম **কুটিরশিল্প** আছে।



আসানসোল - রাণীগঞ্জ - দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল

৩
সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী বালিয়াড়ি অঞ্চল

পশ্চিবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশ কর্দমাক্ত নীচু সমতলভূমি, অসংখ্য সমুদ্র খাঁড়ি, নদীর চওড়া মোহানা, নবগঠিত ছোট ছোট দ্বীপ এবং ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমি নিয়ে গঠিত। এই বনভূমি **সুন্দরবন** নামে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের জমি এত নীচু যে জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনা জলে অনেক জায়গা ভেসে



যায়। অনেক জায়গায় সমুদ্রের জল স্থলভাগের মধ্যে কিছুদূর প্রবেশ করে সমুদ্র খাঁড়ির সৃষ্টি করেছে। বিদ্যাধরী, পিয়ালি, মাতলা, ইছামতি, কালিন্দী, রায়মঙ্গল, হাড়িভাঙ্গা, জামীরা, সপ্তমুখী প্রভৃতি নদী সুন্দর-বনের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। সমুদ্রের মুখে নদীগুলি চওড়া মোহানার সৃষ্টি করেছে।

সুন্দরবনের জমি প্রধানতঃ লবণাক্ত কাদামাটি দিয়ে তৈরি। সমুদ্র-

তীরে অনেক জায়গায় মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী। লবণ ও কাদার পরিমাণ বেশী থাকায় এই অঞ্চলের মাটি চাষের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। এখানে জমি চাষের আওতায় আনার জন্য প্রথমে বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকাবার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর তিন চার বছর জমি চাষ না করে ফেলে রাখা হয় যাতে বৃষ্টির জলে মাটির অতিরিক্ত লবণ ধুয়ে যেতে পারে।

সুন্দরবন অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বছরে প্রায় ২০০ সে.মি. **বৃষ্টিপাত** হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মোট **বনভূমির** শতকরা ৩৭ ভাগ সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায়। এখানকার বন **ম্যানগ্রোভ** জাতীয়। সমুদ্রতীর, নদীর মোহানা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে যে সব জায়গা জোয়ারের জলে ভেসে যায়, সেই সব জায়গায় এই জাতীয় বন সৃষ্টি হয়। সুন্দরবনে সুন্দরী, গেঁও, গরাণ, হেনতাল, গোল, পশুর, কাকড়া, বাইন, ধুন্দল ও বেত প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। সুন্দরী ও গরাণ গাছের কাঠ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা কুঁড়েঘর নির্মাণের কাজে লাগে।

সুন্দরবনের ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর। বিখ্যাত **'রয়াল বেঙ্গল টাইগার'** এইখানে দেখা যায়। এছাড়া এই বনে হরিণ, শূকর ও সাপও আছে। এখানকার নদী, সমুদ্রখাঁড়ি ও সমুদ্র উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

সুন্দরবন অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত। এখানে বন থেকে কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়। ১৯৭৪ সালে এখান থেকে ২৭ হাজার টাকার মোম ও ১২ লক্ষ টাকার কাঠ পাওয়া গেছে। নদী ও সমুদ্র খাঁড়িতে মাছ ধরা হয়। এখানে মাছ-চাষের উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে। **ফ্রেজারগঞ্জে** একটা কারখানা বসিয়ে শুঁটকি মাছ ও মাছের থেকে নানারকম জিনিস তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে ব্যাপকভাবে হাঙ্গরের যকৃতের তেল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এই অঞ্চলে **কৃষিকার্য** উন্নত নয়। বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকাতে না পারলে চাষ করা যায় না। বছরে একবার মাত্র ধানের চাষ হয়। সম্প্রতি এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও পরীক্ষামূলকভাবে তুলো ও চীনা-বাদামের চাষ করা হচ্ছে।

শিল্প বলতে কয়েকটা ধানের কল ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালিতে সরকারী উদ্যোগে ভ্রমণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরে বিস্তীর্ণ বালুচর ও মাঝে মাঝে বালির উঁচু ঢিবি দেখা যায়। বালির এই ঢিবিগুলিকে বালিয়াড়ি বলে। এই অঞ্চলের অনেক জায়গায় নোনা জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। রসুলপুর, পিচাবনি প্রভৃতি কয়েকটা ছোট ছোট নদী এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলটিও অনুন্নত। সমুদ্র-



তীরে অনেক লোক মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। জুনপুটে সামুদ্রিক মাছ নিয়ে গবেষণা করার জন্য একটা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া এখানে শুট্‌কি মাছ ও হাঙ্গরের যকৃতের তেল প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্র-

তীরে লবণ তৈরির কয়েকটা কারখানা আছে। **দীঘার** সমুদ্রতীরে একটি সুন্দর পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

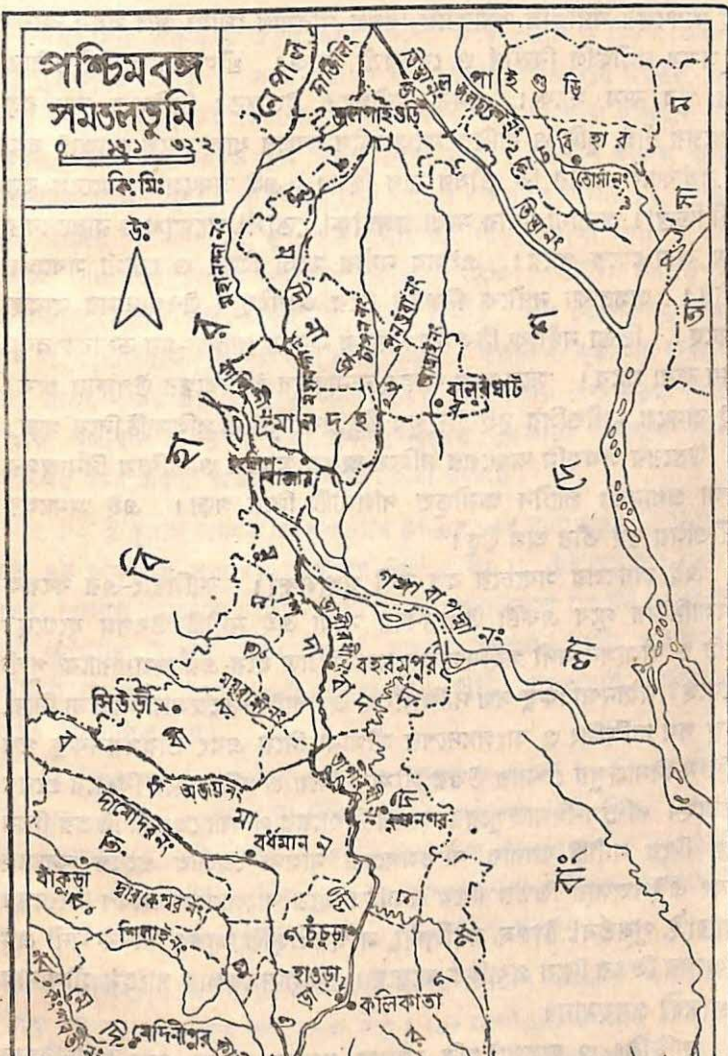
৪

সমভূমি অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গে উত্তরে পার্বত্যভূমি, পশ্চিমে মালভূমি ও দক্ষিণে নিম্ন-ভূমির মাঝখানে পলিগঠিত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দেখা যায়। এই সমতলভূমিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) গঙ্গা-পদ্মার উত্তর দিকে মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলা এবং দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সমতল অংশ নিয়ে **উত্তরের সমতলভূমি** এবং (খ) গঙ্গা-পদ্মার দক্ষিণ দিকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, সুন্দরবন বাদ দিয়ে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলা, এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মালভূমি অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে **দক্ষিণের সমতলভূমি** গঠিত।

(ক) **উত্তরের সমতলভূমি**—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল দক্ষিণ দিকে ক্রমে ঢালু হয়ে এসে সমতলভূমির সাথে মিশেছে। পার্বত্যভূমি ও সমতল-ভূমির মাঝখানের জঙ্গল ও ঘাসে ঢাকা এই উঁচুনীচু ঢালু অংশ **তরাই** ও **ডুয়ার্স** নামে পরিচিত। তিস্তা গিরিখাতের পশ্চিমদিকের ঢালু অংশকে তরাই ও পূবদিকের অংশকে ডুয়ার্স বলে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভূটানে যাওয়ার রাস্তা এই ডুয়ার্সের মধ্য দিয়ে।

কোচবিহার জেলা এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সমতল অংশের ভিতর দিয়ে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন নদীগুলি নেমে এসেছে। পার্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই সব নদী তীব্র খরস্রোতা থাকে। নদীগুলি পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ পাথরের চাঁই, নুড়ি, বালি, পলি ও সামান্য পরিমাণ কাদা বহন করে নিয়ে আসে। সমভূমিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির স্রোত-বেগ কমে যায়। ফলে নদীর জলে পরিবাহিত ঐ সব নুড়ি, পাথর প্রভৃতি থিতিয়ে পড়তে থাকে। এইভাবে তরাই ও ডুয়ার্সের ঢালু অঞ্চল পাথর, নুড়ি, বালি ও পলি মেশানো ছিদ্রবিশিষ্ট মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে।



পশ্চিমবঙ্গ
সমতলভূমি
কিঃমিঃ
উঃ
নেপাল
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
তোর্সা নং
তিস্তা নং
মহানন্দা নং
বালুরঘাট
মালদহ
ইংলিশ বাজার
গঙ্গা বা পদ্মা নং
বহরমপুর
সিউড়ী
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
বর্ধমান
কৃষ্ণনগর
বাঁকুড়া
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
চুঁচুড়া
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
কাঁসাবতী নং
সুবর্ণরেখা নং

এই অঞ্চলের নদীগুলি বর্ষাকালে বিপুল পরিমাণ ঘোলা জল বহন করে। ঐ সময় নদীগুলি বিস্তীর্ণ ও বেগবতী থাকে। গ্রীষ্মকালে নদীগুলিতে জল খুব কম থাকে। প্রশস্ত নদীখাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের চাঁই, নুড়ি ও বালির মাঝে ক্ষীণ জলের ধারা দেখে বোঝাই যায় না বর্ষাকালে নদীর কি ভীষণ রূপ ছিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদী **তিস্তা**। অন্যান্য নদীর মধ্যে **জলঢাকা**, **তোর্সা**, **সঙ্কোশ** ও রায়ঢাকের নাম করা যেতে পারে। এইসব নদীর মধ্যে তিস্তা ও তোর্সা সবচেয়ে দুর্দান্ত। জলঢাকা নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। তিস্তা নদীকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এর ভয়াবহ বন্যা রোধ করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাভাবে উত্তরবঙ্গের উপকার হবে। এই অঞ্চলে নদীগুলির দুই তীর খুব উঁচু এবং পুরনো পলিমাটি দিয়ে গড়া।

উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা প্রধানতঃ প্রাচীন ক্ষয়ীভূত পলিমাটি দিয়ে গড়া। এই অঞ্চলের নদীগুলির দুই তীর অল্প উঁচু।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদী **মহানন্দা**। কার্সিয়াং-এর কয়েক কিলোমিটার পূবে একটা উপত্যকার মধ্যে এই নদীটি উৎপন্ন হয়েছে। মেচি ও বালাসন নদী মহানন্দার সাথে মিলিত হয়ে এর জলধারাকে পুষ্ট করেছে। মহানন্দা কিছু পথ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা দিয়ে, কিছু পথ দার্জিলিং ও বাংলাদেশের সীমানা দিয়ে এবং তারপর কিছু পথ পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার উত্তর সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে। পশ্চিম-দিনাজপুরের সংলগ্ন বিহারের পূর্নিয়া জেলার ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে নদীটি আবার পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে এবং এই জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। **আত্রাই**, **পুনর্ভবা**, **টাঙ্গন**, **কালিন্দী**, **নাগর** প্রভৃতি আরও অনেক নদী এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মালদা জেলার পশ্চিম সীমানায় **গঙ্গানদী** প্রবহমান।

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সমতল অংশে এবং কোচবিহার জেলায় বছরে গড়ে ৩০০ সে.মি.'র বেশী এবং মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রায় ২০০ সে.মি. **বৃষ্টিপাত** হয়। বৃষ্টিপাত প্রায় সবটাই মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রধানতঃ গ্রীষ্মের শেষদিকে হয়ে থাকে।

সমভূমির একেবারে উত্তর অংশ, বিশেষ করে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল **অরণ্যসম্পদে** সমৃদ্ধ। এখানে প্রধানতঃ মৌসুমী পাতাঝরা গাছের বন দেখা যায়। **শাল** এই অঞ্চলের সবচেয়ে দামী গাছ। শাল ছাড়া, চম্পা, চিলনি, খয়ের, গামার ও তুন গাছও দেখা যায়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাঁশঝাড় চোখে পড়ে। নদীতীরে লম্বা ঘাসের জঙ্গল দেখা যায়। পাতাঝরা গাছের মাঝে মাঝে দু'চারটে চিরহরিৎ গাছও দেখা যায়। এই অঞ্চলে নানারকম ভেষজগুণসম্পন্ন লতাগুল্ম জন্মে। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জেলায় বিস্তীর্ণ বনভূমি বিশেষ নেই। শুধু ঝোপঝাড়, তৃণভূমি ও মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ দেখা যায়। তরাই ও ডুয়ার্সের অরণ্যে বাঘ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি **প্রাণী** বাস করে। এখানকার **এক খড়গবিশিষ্ট গণ্ডার** মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য। **জলদাপাড়ায়** সরকারী উদ্যোগে বন্যপ্রাণীদের জন্য একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে।

তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্যাপকভাবে **চা-এর চাষ** করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের মধ্যে মালদা জেলায় সবচেয়ে বেশী **রেশম** এবং কোচবিহার জেলায় সবচেয়ে বেশী **তামাক** উৎপন্ন হয়। **আম** মালদা জেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। এছাড়া, এই অঞ্চলে **ধান, পাট,** ডালকলাই, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

বড় **শিল্প** বলতে একমাত্র তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের চা শিল্পের নাম করা যেতে পারে। ছোটখাটো শিল্পের মধ্যে কাষ্ঠশিল্প, তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প, ধানের কল, পাট গাঁটবন্দী করার কারখানা উল্লেখযোগ্য। কাঠের উপর ভিত্তি করে নানাবিধ শিল্প স্থাপনের সুযোগসুবিধা এই অঞ্চলে আছে। প্রধান বাধা যাতায়াতের সুব্যবস্থার অভাব ও শক্তির অভাব।

(খ) **দক্ষিণের সমতলভূমি**—গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিকের সমতলভূমিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম পাশের সমতলভূমি। এই সমতলভূমি ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম তীর থেকে মালভূমির প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলকে আমরা **দক্ষিণ-পশ্চিম সমতলভূমি** নাম দিতে পারি। (২) ভাগীরথী-হুগলী পূব পাশের সমতলভূমি। এই সমতলভূমি ভাগীরথী-হুগলী নদীর পূর্ব তীর থেকে

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত। এই অঞ্চলকে আমরা **দক্ষিণ-পূর্ব সমতলভূমি** নাম দিতে পারি।

দক্ষিণ-পশ্চিম সমতলভূমি—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে ময়ূরাক্ষী, অজয় ,দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী প্রভৃতি অনেকগুলি নদী পূব দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ভাগিরথী অথবা হুগলী নদীতে পড়েছে। ভাগিরথী-হুগলীর এই সব উপনদীর দ্বারা পরিবাহিত পলিমাটি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম সমতলভূমি গঠিত হয়েছে। এই নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট। ফলে এই সব নদীতে বারমাস জল থাকে না। বর্ষার সময় নদীগুলি ভীষণ আকার ধারণ করে। অন্য সময়ে জলধারা ক্ষীণ ও স্তিমিত হয়ে পড়ে। মালভূমি অঞ্চলে নদীগুলির উৎপত্তিস্থলে ও ঊর্ধ্বগতিপথে বনজঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলায় বৃষ্টির জল অতি দ্রুত অবাধে চারিদিক থেকে এসে নদীগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত জল এক সঙ্গে বহন করার ক্ষমতা নদীর থাকে না। ফলে বর্ষাকালে অনেক সময় নদীর দুই কূল ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে ও বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রায়ই বন্যা এই অঞ্চলের নদীগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নদীগুলির নিম্ন-গতিতে নদীখাত বালি ও পলি জমে তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যায়। ফলে নদীর জল মূল প্রবাহ পথের ভিতর দিয়ে বেরুতে না পেরে দুই দিক দিয়ে একাধিক নালার সৃষ্টি করে বেরুবার চেষ্টা করে। এইভাবে একটা নদী থেকে অনেকগুলি শাখানদীর সৃষ্টি হয়। এই সব শাখানদীর কোনকোনটা আবার কালক্রমে পলি পড়ে বুজে যায় এবং মূল নদীর প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলে এই রকম **কানা, মজা ও মরা নদীখাত** বহু দেখা যায়।

ফরাক্কার কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার গিরিয়ার কাছে **গঙ্গানদী** দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা ভাগীরথী নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর একটি শাখা পদ্মা নাম নিয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে কিছু পথ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। একসময় গঙ্গার মূল জলস্রোত ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত হত। তখন ভাগীরথী এখনকার তুলনায় অনেক বেশী গভীর ও বেগবতী ছিল। তিনশ' বছর আগে গঙ্গার মূল জলধারা ভাগীরথী থেকে পূব-

দিকে সরে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই জলধারা পদ্মার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। বর্তমানে পদ্মাই গঙ্গার জলস্রোতের বেশীর ভাগ বহন করছে। ভাগীরথীর মধ্যে গঙ্গার জলের খুব কম্ অংশই প্রবেশ করে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বছরের মধ্যে প্রায় আট মাস ভাগীরথীর সঙ্গে গঙ্গার প্রায় কোন সংযোগ থাকে না। ঐ সময়ে প্রধানতঃ দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পশ্চিমের উপনদীগুলি আংশিকভাবে ভাগীরথী-হুগলীর জলধারাকে অক্ষুন্ন রাখে। ভাগীরথী নদী পশ্চিমবঙ্গের লোকের কাছে সাধারণভাবে গঙ্গা নামে পরিচিত। উৎপত্তিস্থল থেকে হুগলী শহর পর্যন্ত এই নদীর নাম ভাগীরথী এবং হুগলী থেকে মোহনা পর্যন্ত এর নাম হুগলী নদী। অর্থাৎ ভাগীরথী ও হুগলী একই নদীর বিভিন্ন অংশের নাম। এই নদী পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদীর পশ্চিম তীরের অনেকখানি অংশ পলি জমে উঁচু হয়েছে। এই উঁচু জমির পিছনে জলাভূমি, বিল প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। পলি পড়ে এই সব জলাভূমি আবার আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে আসছে।

ভাগীরথীর পশ্চিমের উপনদীগুলির মধ্যে **ময়ূরাক্ষী** সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত। বক্রেশ্বর, কোপাই (শাল), দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী ময়ূরাক্ষীর সাথে মিশে এর জলধারাকে পুষ্ট করেছে। এই নদীগুলি মালভূমি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বয়ে এসে সমভূমিতে পড়েছে এবং এঁকেবেঁকে পূবদিকে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকালে লাল রঙের মাটি মিশানো জলে নদীগুলি ফুলে ফেঁপে ওঠে। শীতকালে আবার এই সব নদীতে জল প্রায় থাকে না বললেই চলে। পূর্বমুখী হয়ে যেতে যেতে ভাগীরথী নদী থেকে ৫ কি.মি. আগে ময়ূরাক্ষী হঠাৎ দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে। দক্ষিণমুখী হয়ে ভাগীরথীর সাথে সমান্তরালভাবে ৩০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে এই নদীটি কাটোয়া শহরের ২০ কি.মি. উত্তরে দত্তবাটির কাছে ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে। আগে ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রায়ই বন্যা হত। **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা** অনুযায়ী বিহারের অন্তর্গত দুমকার কাছে ম্যাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধের নাম **কানাডা বাঁধ**। বর্ষার অতিরিক্ত জল জলাধারে সঞ্চয় করে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। সিউড়ির কাছে তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর উপর

একটি সেচবাঁধ নির্মাণ করে জলসেচেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও হচ্ছে।

ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণে অজয় নদ প্রবাহিত। বিহারের মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে এই নদ দীর্ঘপথ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে এবং কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। বর্ষাকালে বিপুল পরিমাণ লাল ঘোলা জল প্রবল বেগে এই নদের ভিতর দিয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। অন্য সময়ে নদীতে জল প্রায় থাকে না বললেই চলে। গেরুয়া রঙের বালি জমা চওড়া নদীখাত খা খা করে।

খড়ি, বাঁকা ও বেহুলা নদী অজয় নদের দক্ষিণে পশ্চিম থেকে পূব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সাথে মিশেছে। এই নদীগুলি এক সময়ে দামোদরের সাথে যুক্ত ছিল। নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চল পুরানো পলি দিয়ে গড়া। এখানকার মাটিতে বালির ভাগ বেশী। নদীগুলির নিম্ন অববাহিকায় জলাভূমি দেখা যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম সমভূমি অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী **দামোদর।** দামোদর নদ ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে পালামৌ জেলার খামারপাত পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ঝরিয়ার খনি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা স্পর্শ করেছে। অল্প কিছু দূর পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলার সীমানা দিয়ে এবং তারপর কিছু পথ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদ বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে। শক্তিগড়ের কাছে দক্ষিণদিকে বাঁক নিয়ে দামোদর বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে ফলতার অপর পারে হুগলী নদীর সাথে মিশেছে। বরাকর, শালি প্রভৃতি ৯টি উপনদী বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বৃষ্টির জল বয়ে নিয়ে এসে দামোদর নদে ঢেলে দিচ্ছে।

দামোদর ও তার উপনদীগুলি মালভূমি অঞ্চল থেকে জলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে নিয়ে আসে। এই পলি নদীর মধ্য ও নিম্ন গতিপথে নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়ে। ফলে নদীখাত ক্রমে ভরাট হয়ে উঁচু হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলবহন ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। বর্ষাকালে বিপুল পরিমাণ জলরাশি নদীর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করে। কিন্তু নদীগর্ভের জলধারণ ক্ষমতা কম থাকায় জলরাশি দুই কূল ছাপিয়ে উপচে পড়ে এবং এইভাবে বন্যার সৃষ্টি হয়। আগে নদীর দুই তীরে বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাঁধ যত উঁচু করা হয়েছে, পলি পড়ে নদীগর্ভও সমান তালে উঁচু হয়েছে। ফলে ঐ ধরনের বাঁধ দেওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বন্যার তাণ্ডবে দামোদরের মধ্য ও নিম্ন অববাহিকার জনজীবন তছনছ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৫ ও ১৯৪৩ স্যালের ভয়ঙ্কর বন্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশেষে **দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা** প্রণয়ন করে সার্থকভাবে বন্যারোধ এবং দামোদর উপত্যকার সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর এই পরিকল্পনা কাজে রূপ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে নিম্ন অববাহিকায় দামোদর নদের থেকে অনেকগুলি শাখানদীর সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে এই সব শাখানদীর অনেকগুলি প্রায় মজে এসেছে বা একেবারেই মরে গেছে। কানা ও কানা দামোদর এই রকম দুইটি শাখা। **মুণ্ডেশ্বরী নদী** দামোদরের শাখা হলেও আকারে দামোদরের থেকে বড়। এই নদীটি দামোদরের সঙ্গে রূপনারায়ণের যোগসাধন করেছে। দামোদর ও হুগলী নদীর মাঝখানের অঞ্চল মৃত-প্রায় ও মরা নদীতে পূর্ণ। এক সময় এই সব নদীগুলি বহতা থাকলেও বর্তমানে কচুরিপানায় পূর্ণ বদ্ধ জলায় পরিণত হয়েছে। সরস্বতী এই রকম একটা নদী। এই নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম এক সময়ে সমৃদ্ধ বন্দর ছিল।

দামোদরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদী মিলিত হয়ে **রূপনারায়ণ নদের** সৃষ্টি করেছে। উৎপত্তিস্থল থেকে বেশী জল না পেলেও জোয়ারের সময় নিয়মিতভাবে প্রচুর পরিমাণে জল এই নদীতে প্রবেশ করায় মোহানা থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত নদীটি যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত। দামোদর যেখানে হুগলী নদীতে পড়েছে তার অল্প দক্ষিণে রূপনারায়ণ হুগলীর সাথে মিশেছে। এই নদের অববাহিকা অঞ্চল নীচু ও জলা-ভূমিতে পূর্ণ।

রূপনারায়ণের পশ্চিমে **কংসাবতী বা কাঁসাই নদী** প্রবাহিত। এই নদীটি পুরুলিয়ার মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। মেদিনীপুর

জেলার ভিতর দিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে এই নদী দু'ভাগ হয়ে একটি শাখা রূপনারায়ণের সাথে এবং আর একটি শাখা কেলেঘাই নদীর সাথে মিশেছে। কাঁসাই ও কেলেঘাই-এর মিলিত প্রবাহ **হলদী** নদী নাম নিয়ে হুগলী নদীতে গিয়ে পড়েছে। হলদী নদীর তীরে **হলদিয়া বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র** গড়ে উঠছে। কংসাবতী নদীতে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই নদীর উপত্যকার শেষ অংশ অত্যন্ত নীচু, সমতল ও জলাভূমিতে পূর্ণ।

দক্ষিণ-পশ্চিম সমভূমি অঞ্চলে বছরে গড়ে ১৪০—১৬০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়। অধিকাংশ বৃষ্টি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে হয়ে থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব সমতলভূমি—গঙ্গার দক্ষিণে ভাগীরথী-হুগলী নদী থেকে পূব দিকে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এই অঞ্চলটি বিস্তৃত। ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম দিকের সমভূমির সঙ্গে পূবদিকের এই সমভূমির সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমদিকের সমভূমি দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি ভাগীরথী-হুগলীর **উপনদীগুলির দ্বারা বিধৌত।** কিন্তু পূবদিকের সমভূমি জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী প্রভৃতি গঙ্গার **শাখানদীগুলির দ্বারা বিধৌত।** উপনদীগুলি উৎপত্তিস্থল থেকে জল বহন করে নিয়ে এসে ভাগীরথী-হুগলীতে ঢেলে দেয় এবং এইভাবে ঐ নদীর জলধারাকে পুষ্ট করে। আর শাখানদীগুলি গঙ্গার জল বহন করে নিয়ে সমুদ্রে ঢেলে দেয়। বর্তমানে গঙ্গার জলপ্রবাহ প্রধানতঃ পদ্মার ভিতর দিয়ে বহে যাওয়ায় এই অঞ্চলে অনেকগুলি শাখানদী গঙ্গার জলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। **ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা** এইরকম দুইটি নদী। এই নদী দুইটির সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে গেছে। গঙ্গার অপর দুইটি শাখানদী **জলঙ্গী** ও **চূর্ণী** নদীয়া জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। এই দুইটি নদীও ধীরে ধীরে মজে আসছে। ভাগীরথী-হুগলীর পূবদিকের সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ নদী ধীরে ধীরে মজে আসছে বলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের এই অংশকে **মৃতপ্রায়** বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব-দ্বীপের যে অংশ বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে সেই অংশই এখন প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। সেখানকার নদীগুলি বিপুল পরিমাণ জলধারায় পুষ্ট এবং দ্রুতহারে নূতন ভূমি গঠন করে চলেছে।

ভাগীরথী-হুগলীর পূবদিকের এই সমভূমি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ **হ্রদ, বিল প্রভৃতি জলাভূমি** দেখা যায়। হ্রদগুলি অধিকাংশই বক্রাকৃতি। এই ধরণের হ্রদ আসলে পরিত্যক্ত নদীখাত ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক-দিন আগে কোন নদী ঐ পথ দিয়ে বহে যেত এবং গতিপথের ঐখানে একটা বাঁক ছিল। কালক্রমে বাঁকের মুখে পলি পড়ে নদীর বাঁকানো অংশটা মূল জলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি হ্রদের মত সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে এই ধরনের হ্রদ দেখা যায়। এই হ্রদগুলির মধ্যে যেগুলি গভীর তাদের **দহ** বলে। অনেক জায়গায় এই ধরনের জলাশয়ের স্থানীয় নাম **বাওড়**। বিস্তীর্ণ নীচু জায়গায় জল জমে বিলের সৃষ্টি হয়। কোন কোন বিলে সারাবছর জল থাকে। অন্যগুলিতে শুধু বর্ষার সময় জল থাকে, অন্যসময় শুকিয়ে যায়। এই অঞ্চলে যতই দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায় বিল ও জলাভূমির সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশের সীমান্তের নিকট দিয়ে **ইছামতী নদী** প্রবাহিত। জোয়ারের জল এই নদীর ভিতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করায় নদীটির নিম্নগতিপথ পলিমুক্ত থাকে। ইছামতি হাড়িভাঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। অনেকগুলি ছোট ও বড় নদী এবং খাল চব্বিশ পরগণা জেলার বুকের উপর জালের মত ছড়িয়ে আছে। এই নদীগুলির মধ্যে ইছামতীর কথা আগেই বলা হয়েছে। ইছামতী ছাড়া বেতনা, যমুনা, বিদ্যাধরী, পিয়ালি, মাতলা, কালিন্দী প্রভৃতি নদী এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কলকাতা শহরের যত ময়লা আবর্জনা ও বাড়তি জল সব বিদ্যাধরী নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে চলে যায়। বিদ্যাধরী মজে আসছে।

গঙ্গানদীর দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলে বছরে গড়ে ১৪০—১৬০ সে.মি. **বৃষ্টিপাত** হয়। অবশ্য, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার সমভূমি অঞ্চলে ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃতভাবে কম। অধিকাংশ বৃষ্টি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে হয়ে থাকে।

গঙ্গানদীর দক্ষিণের সমগ্র সমতলভূমি নদীবাহিত **পলিমাটির দ্বারা গঠিত।** নদীতীর থেকে দূরের অঞ্চল পুরানো পলি ও নদীতীরের কাছা-

কাছি অঞ্চল নতুন পলি দিয়ে গড়া। দানার সূক্ষ্মতা অনুযায়ী নতুন পলিকে বেলেমাটি, দোয়াঁশ মাটি, পলিমাটি ও কাদামাটি, এই কয়-ভাগে ভাগ করা যায়। একেবারে নদীতীরে ও নদীগর্ভে বেলেমাটি বেশী দেখা যায়। নদীতীর থেকে দূরে এবং সমভূমির দক্ষিণদিকে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী। দোয়াঁশ মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ প্রায় সমান সমান। সমভূমির বেশীর ভাগ জায়গায় দোয়াঁশ মাটি দেখা যায়। এই মাটি কৃষির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

গঙ্গানদীর দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলে **স্বাভাবিক উদ্ভিদ** প্রায় নেই বললেই চলে। লোকবসতি ও কৃষিকার্য বিস্তারের তাগিদে বনজঙ্গল প্রায় সব কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। আজকাল এই অঞ্চলে গাছপালা যা দেখা যায় তার অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট। এখানে বট ও অশ্বত্থ গাছ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাল, খেজুর, বাঁশ ও বাবলা গাছও চারি-দিকে ছড়ান রয়েছে। মানুষের লাগানো গাছের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল ও নারকেল গাছের নাম করা যেতে পারে। তাল ও খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরি হয়। বাঁশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। বাড়ি-ঘর তৈরির জন্য, ঝাঁকা, ঝুড়ি, কুলো প্রভৃতি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত জিনিস তৈরির কাজে এবং কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসাবে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। নানারকম ঘাস সমভূমির সর্বত্র দেখা যায়। বড় ঘাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেখা যায় কাশ। শরৎকালে সাদা ফুলে নদীতীরের কাশবন অপূর্ব শোভা ধারণ করে। হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম পাশে খস নামে একরকমের ঘাস জন্মে। গরমকালে ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য খস দিয়ে বোনা পর্দা দরজা জানালায় টাঙিয়ে রাখা হয়। আজকাল গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় মোটর গাড়ির ছাদেও খসের মাদুর বিছিয়ে রাখতে দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার সমভূমি অঞ্চলে সাবাই ঘাস ও মাদুর কাঠি জন্মে। সাবাই ঘাস থেকে কাগজ প্রস্তুত হতে পারে। মাদুর কাঠি দিয়ে মাদুর তৈরি হয়। জলাভূমি অঞ্চলে শোলা ও হোগলা জন্মে। হোগলার আর এক নাম এলিফ্যান্ট গ্র্যাস। গ্রামাঞ্চলে কুঁড়েঘর তৈরির কাজে হোগলা ব্যবহার করা হয়। শোলা দিয়ে টুপি, খেলনা, বরকনের মাথার টোপর, প্রতিমার সাজ ও নানাবিধ অলঙ্কার প্রভৃতি তৈরি হয়। এই অঞ্চলে উলুখড় নামে আর এক রকমের ঘাস জন্মে। উলুখড় দিয়ে

কুঁড়েঘরের চাল ছাওয়া হয়। সমভূমি অঞ্চলের জলাভূমিতে নানা-রকমের ফুল, ফল ও শাকসব্জি জন্মে। ফুলের মধ্যে পদ্ম ও শালুক, ফলের মধ্যে পানিফল এবং শাকের মধ্যে কলমি ও হিঞ্চের নাম করা যেতে পারে। বহু রকম প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ যেমন এখানে জন্মে তেমনি নানা-রকম অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর উদ্ভিদও এখানে দেখা যায়। এ অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষতিকর উদ্ভিদ কচুরিপানা। কচুরিপানা পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য নদী, নালা, খাল, বিল, হ্রদ ও পুকুরের সর্বনাশ করছে।

গঙ্গানদীর দক্ষিণের সমতল অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও ঘন লোকবসতিপূর্ণ। এই অঞ্চলে ধান, পাট, আলু, নানারকম ডালকলাই, তৈলবীজ ও আখ উৎপন্ন হয়।

এই অঞ্চলের অন্তর্গত **কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল** পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। এখানে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প, ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্প, মোটর-গাড়ী নির্মাণ শিল্প, স্টীমার ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প, নানারকম ছোট ও বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কাচ শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, রেয়ন শিল্প, চামড়া শিল্প প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। হুগলী নদীর দুই তীরে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পাটের কল দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে এখানেই সবচেয়ে বেশী পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের অন্যতম প্রধান শহর, বন্দর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

উত্তর দাও

১. ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? বিভাগগুলির নাম কর।
২. পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র এঁকে প্রাকতিক বিভাগগুলি দেখাও।
৩. খুব ছোট করে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লেখ।
৪. পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের চারটি পাহাড় ও চারটি নদীর নাম কর।

৫. পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল কি প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ? ঐ সম্পদের ভাল-ভাবে ব্যবহার হচ্ছে না কেন?

৬. পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৭. পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কোন্‌টি? ঐ পাহাড়টি কোন্‌ জেলায় অবস্থিত?

৮. মালভূমি অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ কি?

৯. পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী কোন্‌টি?

১০. দক্ষিণ-পশ্চিম সমতলভূমির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব সমতলভূমির পার্থক্য কি কি?

১১. পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলটি কোন্‌ প্রাকৃতিক বিভাগের অন্তর্গত? ঐ শিল্পাঞ্চলের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির নাম কর।

১২. জলদাপাড়া কোথায় অবস্থিত এবং কিসের জন্য বিখ্যাত?

১৩. পশ্চিমবঙ্গের কোথায় দহ ও বিল বেশী দেখা যায়? ঐগুলি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

১৪. দক্ষিণ-পশ্চিম সমভূমি অঞ্চলের নদীগুলির বর্ণনা কর।

১৫. সুন্দরবন অঞ্চলে কি কি গাছ ও প্রাণী দেখা যায়? সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণীটির নাম কর।

১৬. সুন্দরবন অঞ্চলে ভালভাবে ফসল ফলাতে হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?

১৭. নিম্নলিখিত শহরগুলির কোনটা কোন্‌ প্রাকৃতিক বিভাগে অবস্থিত:

(ক) কলকাতা
(খ) আসানসোল
(গ) দার্জিলিং
(ঘ) হাওড়া
(ঙ) পুরুলিয়া
(চ) শিলিগুড়ি
(ছ) কাকদ্বীপ

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে গত ২৭ বছরে জাতির সামনে যে অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও কঠিন সমস্যা হ'ল দারিদ্র্য দূর করার সমস্যা। দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে অর্থ-নৈতিক উন্নতি প্রয়োজন। আর, ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায় উৎপাদন না বাড়াতে পারলে, নতুন নতুন শিল্প না গড়ে তুলতে পারলে, রাস্তাঘাট রেলপথ প্রভৃতি যাতায়াত ব্যবস্থার প্রসার না ঘটাতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নতি করা যাবে না।

এই সব কাজ সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে ও তাড়াতাড়ি করা যায় যদি আগে থেকে ভালভাবে ভেবেচিন্তে, কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুনো যায়। এই কারণে, ১৯৫০ সাল থেকে আমাদের জাতীয় সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে সেই সব পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করছেন। সমগ্র দেশের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির কাজ চলছে। এই কাজের ফলে গত ২৫ বছরে শিল্প, সেচ, পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই রাজ্য অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ-পর্যন্ত এই রাজ্যে সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঐ সব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের ফলে কতখানি উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

১

সেচব্যবস্থা

কৃষিকার্যের জন্য জল অবশ্য প্রয়োজনীয়। সব ফসলের জন্য একই পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না। কোন ফসলের জন্য বেশী,

আবার কোন ফসলের জন্য কম জলের দরকার হয়। পশ্চিমবঙ্গে যে সব ফসলের চাষ হয়, তার মধ্যে ধান, পাট ও চা প্রধান। এই তিনটি ফসলের জন্যই জলের প্রয়োজন হয় প্রচুর। এই রাজ্যে চাষের কাজে প্রয়োজনীয় জলের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করা হয় বৃষ্টিপাতের উপর। এখানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত ঘটে। মৌসুমী বায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য অনিশ্চয়তা। বৃষ্টিপাত কোন বছর প্রয়োজনের তুলনায় বেশী, কোন বছর কম এবং কোন বছর ঠিকমত হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলে অজন্মা দেখা দেয়। ফলে কৃষকের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত। ভাল ফসল না জন্মালে, কৃষির অবস্থা খারাপ হলে, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত রকমের কার্যকলাপেই মন্দা দেখা দেয় এবং গোটা দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। ফসল উৎপাদনে নিশ্চয়তা আনতে হলে, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। আর বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। **পশ্চিমবঙ্গের মত মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে কৃষিকার্যে স্থিরতা আনার জন্য জলসেচ ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়।**

এই রাজ্যে সব বছরে যেমন সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না, তেমনি সব জায়গায়ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান নয়। বিশেষ করে রাজ্যের মালভূমি অঞ্চলে অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলা এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাত কৃষির পক্ষে যথেষ্ট নয়। **মালভূমি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল ফলাতে হলে জলসেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।**

এই রাজ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, এমনকি, ভারতের অনেক রাজ্যের তুলনায় কম। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশী পাটের চাষ হয় এবং পাটই এই রাজ্যের সর্বপ্রধান অর্থকরী ফসল। অথচ, আসামে যেখানে এক হেক্টর জমিতে ১৪২০ কি.গ্রা. পাট উৎপন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে হয় মাত্র ১০৯০ কি.গ্রা.। এই রাজ্যে এক হেক্টর জমিতে ধান হয় ১৩৫০ কি.গ্রা.। অন্ধ্র, কর্ণাটক ও কেরালায় হয় ১৫০০ থেকে ২০০০ কি.গ্রা., পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ুতে হয় ২০০০ কি.গ্রা.'র বেশী। জাপানে এক হেক্টর

জমিতে ৪২০০ কি.গ্রা. ধান উৎপাদিত হয়। এই হিসাব থেকে আমরা বুঝতে পারি কৃষির ফলনের দিক দিয়ে এই রাজ্য কত পিছিয়ে আছে। উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করে আমরা কৃষির ফলন বাড়াতে পারি। তাইচুং, আই আর-৮, জয়া, পদ্মা প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ এই রাজ্যে কিছু কিছু ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই সব উচ্চ ফলনশীল বীজের থেকে ভাল ফল পেতে হলে প্রচুর জল ও সারের প্রয়োজন। সুতরাং, **এই রাজ্যে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়িয়ে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হ'লে জলসেচের ব্যবস্থা অপরিহার্য।**

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। অধিকাংশ বৃষ্টি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। বছরের অন্যান্য সময় বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। এই কারণে, বৃষ্টির জলের সাহায্যে এই রাজ্যে অধিকাংশ জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল ফলানো হয়। অন্য সময় ঐ সব জমি পতিত পড়ে থাকে এবং চাষীরা বেকার বসে থাকে। এই রাজ্যে চাষের জমিতে বছরে একবারের বেশী ফসল ফলাতে পারলে অর্থাৎ একফসলী জমিগুলিকে দু-ফসলী বা তিন-ফসলী করতে পারলে আমরা এই রাজ্যে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের যে ঘাটতি আছে তাতো পূরণ করতে পারবোই, উপরন্তু প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসল বাইরে বিক্রি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারবো। কিন্তু **এই কাজ করতে হ'লে সবচেয়ে আগে দরকার ব্যাপক জলসেচ ব্যবস্থার।**

জলসেচের পদ্ধতি—পশ্চিমবঙ্গে নানারকম পদ্ধতিতে জলসেচ হয়ে থাকে। এখানে পুকুর, কূপ, নলকূপ ও খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা দেখা যায়। **পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়**-থেকে ডোঙার সাহায্যে জল তুলে জমিতে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও একটা বড় পাত্রের দুই দিক দড়ি দিয়ে বেঁধে, দু'পাশে দু'জন লোক সেই দড়ি ধরে দোলনার মত দুলিয়ে দুলিয়ে জলাশয় থেকে জল তুলে জমিতে দিয়ে থাকে। অবশ্য, এই সব পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে জলসেচ করা যায় না। আজকাল ডিজেল ও বিদ্যুৎচালিত পাম্পের সাহায্যে জল তুলে জমিতে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে জলসেচ করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রসার ডিজেল তেলের সরবরাহ ও দাম এবং পল্লী অঞ্চলে



পশ্চিমবঙ্গ
জলসেচ
সেচ দ্বারা উপকৃত অঞ্চল
উঃ
তিস্তা নং
জলঢাকা নং
তোর্সা নং
মহানন্দা নং
গঙ্গা বা পদ্মা নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
কংসাবতী নং
হলদী নং
সুবর্ণরেখা নং
বিদ্যাধরী
বঙ্গোপসাগর

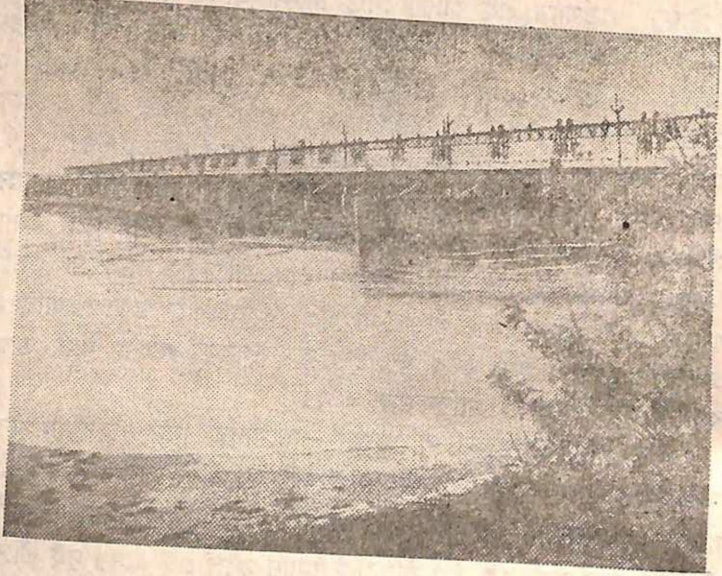
বিদ্যুতের প্রসারের উপর নির্ভর করে। ইদানীং, এই রাজ্যে **নলকূপের** (টিউবওয়েল) সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গ্রামের চাষীর মুখে 'ডিপ' ও 'শ্যালো' টিউবওয়েলের নাম প্রায়ই শোনা যায়। এই সব টিউবওয়েলও বিদ্যুৎচালিত। ফলে, নলকূপের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের সরবরাহের উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতা অর্জনের আগে **খালের** সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা এই রাজ্যে ছিল না বললেই চলে। ঐ সময় জলসেচের জন্য দামোদর খাল ও ইডেন খাল, মাত্র এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ খাল এই রাজ্যে ছিল।

সেচপ্রকল্পসমূহ—স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে গত ২৭ বছরে এই রাজ্যে কৃষির উন্নতির তাগিদে জলসেচ ব্যবস্থার অনেকখানি প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে এই রাজ্যে মোট চাষের জমির শতকরা ২৬ ভাগ সেচের জল পেয়ে থাকে। সেচব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে এই রাজ্যে অনেকগুলি বড়, মাঝারি ও ছোট সেচ প্রকল্প রচনা ও কার্যকরী করা হয়েছে। এই সব প্রকল্পের মধ্যে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্প দু'টির কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। এই দু'টি প্রকল্পের সাহায্যে শুধু যে জলসেচের প্রসার ঘটেছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, মাছের চাষ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি আরও বহু উপকার পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে যে প্রকল্পের সাহায্যে একটা নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে একসাথে বহু উপকার পাওয়া যায়, তাকে **বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা** বলে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—দামোদর নদ ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বরাকর, বোকারো ও কোনার দামোদরের প্রধান উপনদী। দীর্ঘদিন ধরে দামোদর নদে বারবার বন্যার ফলে এই নদের দুই তীরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, এক কথায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্য সামনে রেখে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রচনা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাকর নদীর উপর বাঁধ বেঁধে

তিলাইয়া ও **মাইথন** এই দুইটি জলাধার, **কোনার** নদীর উপর বাঁধ দিয়ে একটি জলাধার এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ের কোলে দামোদর নদের উপর বাঁধ দিয়ে **পাঞ্চেৎ** জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। এই সব বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের ফলে দামোদর নদে বন্যার প্রকোপ অনেকখানি কমে গেছে।

তিলাইয়া জলাধারের সঙ্গে ৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। মাইথন ও পাঞ্চেৎ জলাধারের সঙ্গেও যথাক্রমে ৬০ মেগাওয়াট ও ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। জলাধারগুলিতে সঞ্চিত জল কাছাকাছি অবস্থিত কারখানাগুলিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। **দুর্গাপুরে** দামোদরের উপর একটি ৭০০ মি. লম্বা এবং



দুর্গাপুরের কপাট বাঁধ

১১.৬ মি. উঁচু **কপাট বাঁধ** নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধের পিছনে দুই দিক থেকে দু'টি বড় খাল কাটা হয়েছে। এই দু'টি খাল থেকে আবার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে এই

প্রকল্পের দ্বারা ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪ লক্ষ হেক্টর জমি জলসেচের সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প—ময়ূরাক্ষী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের বড় সেচ প্রকল্পগুলির অন্যতম। ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত ত্রিকূট পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দত্তবাটীর কাছে ভাগীরথী নদীতে পড়েছে। ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই ময়ূরাক্ষীর প্রধান উপনদী। এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৪০ কি.মি.। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প অনুযায়ী বিহারের অন্তর্গত দুমকার কাছে **ম্যাসাঞ্জোরে** এই নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। এই জলাধারটি ৬৬০ মি. লম্বা, ৪৬ মি. উঁচু এবং এর আয়তন ৬৩ বর্গ কি.মি.। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল এই জলাধারে সঞ্চয় করে রাখা হয়। এর ফলে বন্যার সম্ভাবনা দূর হয়েছে। কানাডার অর্থ সাহায্যে তৈরি হয়েছে বলে এই বাঁধের নাম দেওয়া হয়েছে **কানাডা বাঁধ**। কানাডা বাঁধ থেকে ৩২ কি.মি. দূরে সিউড়ির কাছে **তিলপাড়ায়** ময়ূরাক্ষীর উপর একটি কপাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধের পিছন দিকে ময়ূরাক্ষীর দুই তীর থেকে দু'টি প্রধান খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ দু'টি খাল থেকে আবার বহু শাখা প্রশাখা বের করা হয়েছে। শাখাপ্রশাখা সমেত মোট খালের দৈর্ঘ্য ১৭০০ কি.মি.। এই প্রকল্পে ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই নদীতেও ছোট ছোট কপাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের দ্বারা ১৯৭১-৭২ সালে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়েছে। এই জমির অধিকাংশই বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। বর্ধমান জেলার অল্প পরিমাণ জমি সেচের জন্য ময়ূরাক্ষীর জল পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পের দ্বারা সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে বীরভূম জেলা। এই জেলার উর্বর অথচ রুক্ষ মাটি ময়ূরাক্ষীর সেচের জলে সিক্ত হওয়ার ফলে ধানের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। রবি মরশুমে এই প্রকল্প থেকে কিছু পরিমাণ সেচের জল পাওয়া যায় বলে রবিশস্যের উৎপাদনও কিছুটা বেড়েছে। কানাডা বাঁধের সংলগ্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এই কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা, অবশ্য, ৪ হাজার কিলোওয়াট।

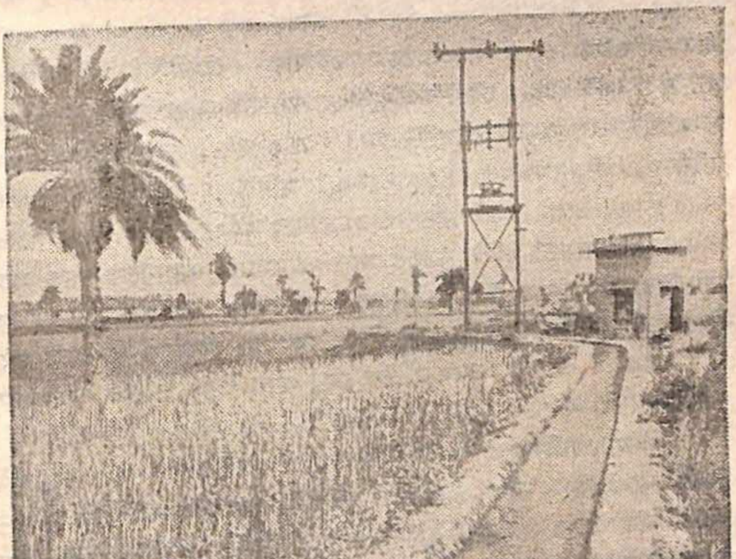
ময়ূরাক্ষী প্রকল্পটি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার তুলনায় অনেক ছোট হলেও অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে এই প্রকল্পটিকে কাজে পরিণত করা হয়েছে। আমরা একথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে পারি যে পুরো-পুরিভাবে বাঙালী ইঞ্জিনিয়াররাই এই প্রকল্পটিকে রূপদান করেছেন।

কংসাবতী প্রকল্প—পশ্চিবঙ্গের বড় জলসেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে কংসাবতী প্রকল্প অন্যতম। এই প্রকল্পের কাজ চলছে। সম্পূর্ণ হলে এই প্রকল্পের দ্বারা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ৪ লক্ষ ১৪ হাজার হেক্টর রুক্ষ জমি সেচের সুবিধা পাবে। ১৯৭১-৭২ সালের খরিফ মরশুমে এই প্রকল্পের দ্বারা ১ লক্ষ ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়েছে। কংসাবতী প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করতে মোট ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

মাঝারি সেচ প্রকল্প—এই রাজ্যের মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে মেদিনীপুর খাল প্রকল্প ৪০ হাজার হেক্টর, জলপাইগুড়ি জেলার করতোয়া সেচ প্রকল্প ৪ হাজার ৯ শ' হেক্টর এবং বাঁকুড়া জেলার শুভঙ্কর দাঁরা সেচ প্রকল্প ২ হাজার ৪ শ' হেক্টর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করছে। এই রাজ্যে যে সব মাঝারি সেচ প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে তাদের মধ্যে সাহারাজোড় সেচ প্রকল্প অন্যতম। এই প্রকল্পের দ্বারা পুরুলিয়া জেলার ১২০০ হেক্টর অনুর্বর জমিতে জলসেচ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ হলে এই প্রকল্পের দ্বারা মোট ৫ হাজার ১ শ' হেক্টর জমি সেচের জল পাবে। এছাড়া পুরুলিয়ার বন্ধ সেচ প্রকল্প ও বীরভূমের হিংলো সেচ প্রকল্পের কাজ পঞ্চম যোজনা কালে শেষ হলে যথাক্রমে ২ হাজার হেক্টর ও ১২ হাজার ২ শ' হেক্টর জমি সেচের জল পাবে।

স্বাধীনতা অর্জনের আগে এই রাজ্যে **নলকূপের** সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসারের ফলে নলকূপের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসার ঘটছে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই রাজ্য ২০১১টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৬৭টি নলকূপ চালু করা হয়েছে। ইদানীং গভীর নলকূপের পাশাপাশি অগভীর নলকূপের প্রচলন হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর গড়ে ৫৬ লক্ষ হেক্‌টর জমিতে কৃষিকাজ করা হয়। এই পরিমাণ জমির শতকরা ২৬ ভাগ সেচের সুবিধা পাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির দিক দিয়ে এই রাজ্য ভারতের অপর কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অন্ধ্রপ্রদেশে মোট কৃষিজমির শতকরা ৩১ ভাগ জলসেচের সুবিধা পেয়ে থাকে। তামিলনাড়ুতে মোট কৃষিজমির শতকরা ৪০ ভাগ, হরিয়ানায় শতকরা ৫৩ ভাগ এবং পাঞ্জাবে শতকরা ৭১ ভাগ সেচের জল পেয়ে থাকে। এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার



নলকূপের সাহায্যে জলসেচ

শতকরা ৫৭.৫ ভাগ কৃষিকার্যে নিযুক্ত। শিল্পোন্নতি ঘটলেও কৃষিই এই রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কারণে জলসেচ ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই রাজ্যে জলসম্পদের অভাব নেই। শুধু প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও ব্যবহার।

২

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিষ্কাশন

আগেই বলা হয়েছে, মৌসুমীবায়ুর খামখেয়ালীপনার জন্য এই রাজ্যে কোন বছর বৃষ্টি বেশী, আবার কোন বছর কম হয়। অতিবৃষ্টির বছরে রাজ্যের কোন কোন জায়গায় বন্যা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে। সমভূমি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় পলি থিতিয়ে পড়ে ও নদীগর্ভ ভরাট হতে থাকে। এই ভাবে নদীগুলির জল বহন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। কোন বছর বৃষ্টি বেশী হলে এবং সেই কারণে বেশী জল নদীগর্ভে ঢুকলে নদীর দুই কূল ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে ও বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রায় প্রতি বছরই রাজ্যের কোন না কোন অঞ্চলে যেমন খরা দেখা দেয় তেমনি অন্য কোন কোন অঞ্চলে বন্যার তাণ্ডব চলে। এই কারণে, স্থায়িভাবে কৃষির উন্নতি এবং ফসল উৎপাদনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হলে জলসেচের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক নীচু জায়গায় বছরের অধিকাংশ সময়, কোথাও কোথাও বারমাস জল বেধে থাকে। ঐ সব জায়গার জল বের করে দিতে পারলে, চমৎকার ফসল ফলানো যায়।

স্বাধীনতা অর্জনের আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিষ্কাশনের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না। ব্যক্তিগত স্বার্থে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে ওখানে বন্যা রোধ করার জন্য দু'একটা বাঁধ দেওয়া হত। স্বাধীনতা লাভের পর, বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যার পর থেকে সরকারের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মত বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলিতে জলসেচ ও অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও হয়েছে। এই ধরনের বহুমুখী পরিকল্পনা ছাড়াও শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিষ্কাশনের জন্য এই রাজ্য অনেকগুলি প্রকল্প কার্যে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যে ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৮৩ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, ২৫টি নগরী ও প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যার হাত থেকে বেঁচেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি ৪০০ কি.মি. দীর্ঘ নীচু

বাঁধকে উঁচু করা হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৫টি নগর বাঁধ প্রকল্প, ৩৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ ও ১৩টি জল-নিষ্কাশন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ২৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে এবং নতুন আরও অনেকগুলি বাঁধ ও জল-নিষ্কাশন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো শেষ হলে ১৮৯০ বর্গ কি.মি. জমি প্লাবনের হাত থেকে বাঁচবে। এছাড়া **নিম্ন দামোদর প্রকল্প** শেষ হলে ১৫৫৪ বর্গ কি.মি. এলাকা বাঁচবে। **কেলেঘাই প্রকল্প** ও **মহানন্দা প্রকল্পের** দ্বারাও যথাক্রমে ১২৯৫ বর্গ কি.মি. ও ৬২০ বর্গ কি.মি. রক্ষা পাবে। মহানন্দা প্রকল্পের কাজ যেটুকু শেষ হয়েছে তার ফলে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া ও খরবা থানা বন্যার হাত থেকে রেহাই পাবে। জল-নিষ্কাশন প্রকল্প-গুলির মধ্যে চব্বিশ পরগণা জেলায় **সোনারপুর-আরাপাঁচ প্রকল্প** ও মেদিনীপুর জেলায় **ডুবদা বেসিন প্রকল্পের** নাম করা যেতে পারে। প্রথমটির কাজ শেষ হয়েছে ও দ্বিতীয়টির কাজ চলছে।

৩

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক সংহতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি একান্তভাবে প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হচ্ছে, শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকা চাই। আবার, কৃষিক্ষেত্রে যে সার, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি কাছাকাছি গ্রামে তৈরি হয় না ; আনতে হয় দূর শহরাঞ্চল থেকে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা না থাকলে শহর থেকে গ্রামে ঐসব জিনিস আনা সম্ভব নয়। কলকারখানায় নানারকম কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্রভৃতি ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করা হয়। এই সব জিনিস কখনই একসঙ্গে কারখানার কাছে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে আসতে হয়। এর জন্য দরকার ভাল যাতায়াত ব্যবস্থার। এই রাজ্য থেকে বিদেশে যে সব মালপত্র রপ্তানি করা হয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রথমে সেগুলো সংগ্রহ করে কলকাতা বন্দরে

নিয়ে আসতে হয়। তেমনিভাবে বিদেশ থেকে যেসব মাল আমদানি হচ্ছে, সেগুলো কলকাতা বন্দরে জাহাজ থেকে খালাস করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাতে হয়। এইভাবে আমদানি-রপ্তানির জন্য বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগের যোগাযোগের ভাল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে যাতায়াত-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে।

যাতায়াতব্যবস্থা প্রধানতঃ চার রকমঃ (১) রাজপথ, (২) রেলপথ, (৩) জলপথ ও (৪) আকাশপথ। রাস্তা, রেলপথ ও নদীনালার মাধ্যমে প্রয়োজনমত ঠিক জিনিসটি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সব কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে চলবে। আর রাস্তা, রেলপথ প্রভৃতি যোগাযোগের পথে কোথাও কোন গোলমাল দেখা দিলে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে পড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মানুষের দেহের শিরা উপশিরার সঙ্গে তুলনা করা যায়। শিরা উপশিরাগুলি যেমন দেহের প্রতিটি কোষে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তেমনি, যোগাযোগব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ, গ্রাম ও শহরে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ ক'রে দেশের সমস্ত কাজকর্ম চালু রাখে।

পশ্চিমবঙ্গে সব রকম যাতায়াতের ব্যবস্থাই দেখা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে এই রাজ্যের যাতায়াতের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গত ২৬--২৭ বছরে এই রাজ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শুধু যে দেশ-বিভাগজনিত ক্ষতি সামলে নেওয়া হয়েছে তাই নয়, রাজপথ, রেলপথ ও আকাশ পথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করা হয়েছে।

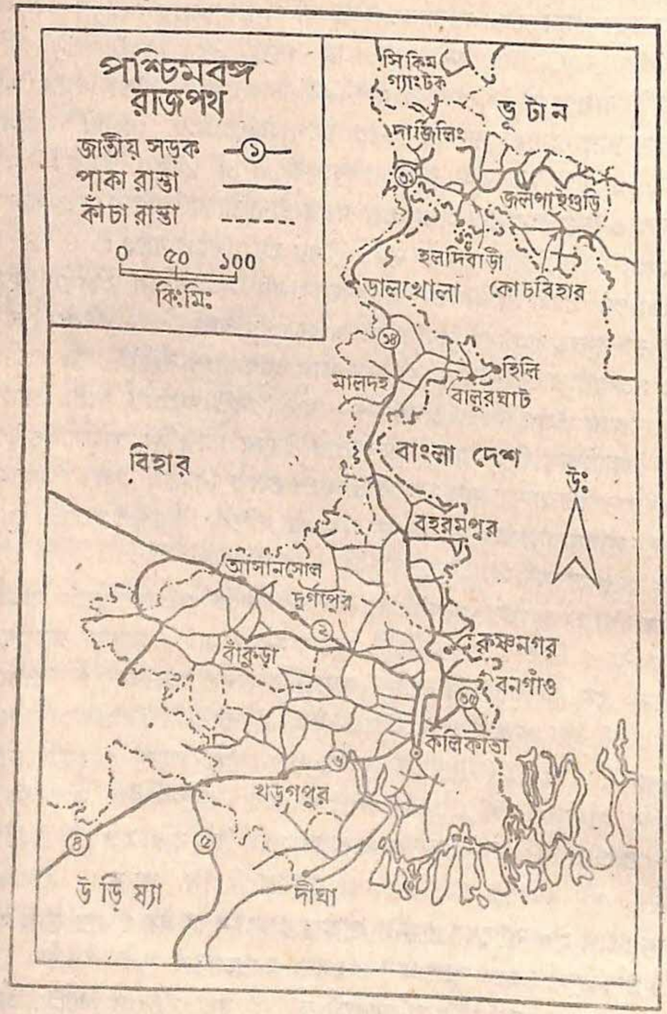
রাজপথ---স্বাধীনতা অর্জনের আগে এই রাজ্যে রাজপথ পরিবহন-ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। রাজপথ নির্মাণ করার পক্ষে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা আছে। এখানকার মাটি নরম। রাস্তা তৈরির মালমশলারও অভাব আছে। ঋতুর আবর্তনের ফলে শুক্‌নো ঋতুতে কাঁচা রাস্তাগুলো ধুলোয় ভর্তি

হয়ে যায়। বর্ষাকালে ঐ ধূলোর উপর বৃষ্টি পড়ে হাটুসমান কাদার সৃষ্টি হয় এবং গাড়ি-ঘোড়া চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে এই রাজ্যে কাঁচা রাস্তা সারা বছর যানবাহন চলাচলের পক্ষে, বিশেষ করে আধুনিক বড় যানবাহন চলাচলের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী। এমনকি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের জন্য এই রাজ্যে পাকা রাস্তা নির্মাণ করার ও ব্যবহারোপযোগী রাখার খরচ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। অসংখ্য নদীনালা, খালবিল এই রাজ্যের বুকের উপর ছড়িয়ে আছে। ফলে, রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টানা রাস্তা তৈরি করতে হলে বহু ছোট বড় সেতু নির্মাণ করতে হয়। এর ফলে খরচ বাড়ে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময় এই রাজ্যে ১৯০০ কি.মি. সরকারী রাস্তা, ৩৩২৫ কি.মি. জেলা বোর্ডের রাস্তা এবং ৩৭০০ কি.মি. পৌর সঙ্ঘের রাস্তা ছিল। পৌরসঙ্ঘের অধিকাংশ রাস্তাই ছিল খারাপ। এই রাজ্যের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ—এই তিনটি অংশের মধ্যে সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল না। একেবারে উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। গঙ্গানদী রাজ্যের দক্ষিণ অংশকে মধ্যের মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে পৃথক্ করে রেখেছিল।

স্বাধীনতা লাভের পরেই সরকার যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই রাজ্যের রাজপথের উন্নতির জন্য অনেকগুলি প্রকল্প কাজে পরিণত করেছেন। প্রথমেই কাজের সুবিধার জন্য রাজপথগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ (ক) জাতীয় সড়ক, (খ) রাজ্য সড়ক, (গ) জেলা সড়ক ও (ঘ) অন্যান্য অপ্রধান সড়ক। আপাততঃ এই রাজ্যের প্রতি ২৫৯ বর্গ কি.মি. এলাকার জন্য ৮৪ কি.মি. সড়ক প্রয়োজন বলে স্থির করা হয়। ঐ হিসাব অনুযায়ী এই রাজ্যের প্রয়োজন ২৯ হাজার কি.মি. সড়ক। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ২০ বছরের একটা প্রকল্প রচনা করা হয়। এর জন্য ২৫০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই রাজ্যে ৮০৪ কি.মি. সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করা হয় এবং ২২৫২ কি.মি. সড়ক তৈরির কাজ চলতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ৩২০০ কি.মি. সড়ক তৈরির


পশ্চিমবঙ্গ
রাজপথ
জাতীয় সড়ক
পাকা রাস্তা
কাঁচা রাস্তা
০ ৫০ ১০০
কিঃমিঃ
সিকিম
গ্যাংটক
ভুটান
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
হলদিবাড়ী
ডালখোলা
কোচবিহার
হিলি
মালদহ
বালুরঘাট
বাংলা দেশ
বিহার
উঃ
বহরমপুর
আসানসোল
দুর্গাপুর
বাঁকুড়া
কৃষ্ণনগর
বনগাঁও
কলিকাতা
খড়গপুর
দীঘা
উড়িষ্যা

কাজ শেষ হয়। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় যে সড়ক তৈরি হয় তার ফলে এই রাজ্যের প্রতিটি জেলাশহর, মহকুমা শহর ও থানা রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে ভাল রাস্তার দ্বারা যুক্ত হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** ২৭০০ কি.মি. সড়ক নির্মিত হয়। এছাড়া অনেকগুলি সেতু ঐ সময়ে নির্মাণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে যে সব রাস্তার কাজ শেষ করা যায়নি, সেগুলো সম্পূর্ণ করা ছাড়াও ৩২১৮ কি.মি. নতুন রাস্তা নির্মাণের একটা পরীক্ষামূলক প্রকল্প **চতুর্থ পরিকল্পনার** জন্য তৈরি করা হয়।

গত ২৬-২৭ বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ফলে সড়ক পরিবহনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯৭৩ সালে এই রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কের একটা হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল ঃ

জাতীয় সড়ক	..	১৫৮২ কি.মি.
রাজ্য সড়ক	..	২৩৩৪ ,, ,,
অন্যান্য সড়ক	..	১১৩৩৯ ,, ,,
		১৫২৫৫ কি.মি.

নিম্নলিখিত **জাতীয় সড়কগুলি** পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে গেছে ঃ

১. ২ নং জাতীয় সড়ক—কলকাতা থেকে দিল্লী।

২. ৬ নং জাতীয় সড়ক—কলকাতা থেকে বোম্বাই ও কলকাতা থেকে মাদ্রাজ।

৩. ৩১ নং জাতীয় সড়ক—বিহার থেকে আসাম। এই সড়কটি বিহার থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গের ডালখোলা, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার হয়ে আসামের দিকে গেছে।

৪. ৩১ (ক) নং জাতীয় সড়ক—শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক।

৫. ৩৪ নং জাতীয় সড়ক—কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি। এই সড়কটি চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা অতিক্রম করে, ফরাক্কা বাঁধের উপর দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গেছে।

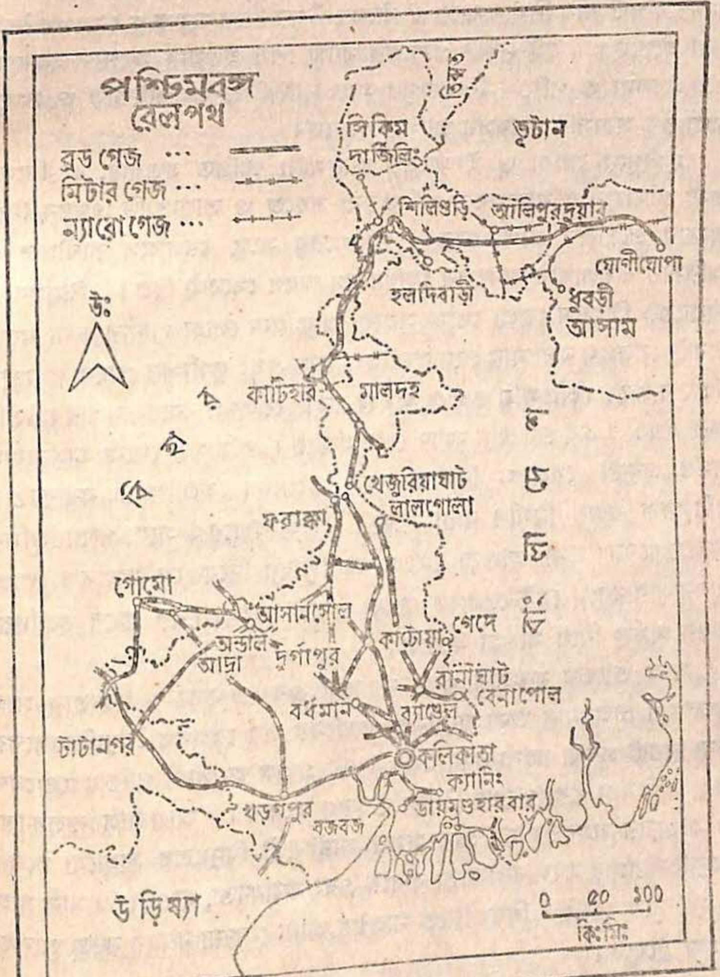
৬. ৩৫ নং জাতীয় সড়ক—কলকাতা থেকে বনগাঁ হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত।

৭. ৪১ নং জাতীয় সড়ক—কোলাঘাট থেকে হলদিয়া পর্যন্ত। কোলাঘাটের কাছে এই সড়কটি ৬ নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

রাজপথে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা শহর, উত্তরবঙ্গ ও দুর্গাপুরের জন্য পৃথক্ তিনটি কর্পোরেশন গঠন করেছেন। এইসব কর্পোরেশনের মালিকানায় নতুন ও উন্নত ধরনের বড় বাস রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করছে।

কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত দ্রুতগামী যানবাহন চলাচলের উপযোগী **কলকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেসহাইওয়ে** নির্মাণ করা হচ্ছে। রাজ্যের কয়লাখনি অঞ্চলে রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য কাজ চলছে।

রেলপথ—পশ্চিমবঙ্গে সব রকম যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথ সর্বপ্রধান। এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগসাধন, যাত্রী চলাচল এবং মালপত্র আদান-প্রদান প্রধানতঃ রেলপথের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কলকাতা বন্দর, কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল এবং দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের উন্নতি রেলপথের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে তিনটি বিচ্ছিন্ন টুকরো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগে যে রেলপথের সাহায্যে কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সরাসরি যুক্ত ছিল, দেশবিভাগের ফলে সেই রেলপথের মাঝখানের বড় অংশ পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) মধ্যে পড়ে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের সঙ্গে দক্ষিণ অংশের রেলপথে সরাসরি যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়। এই রাজ্যে গঙ্গার উপর সেতু না থাকায় মধ্যের মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাও রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য স্বাধীনতা অর্জনের পর দুইটি বড় প্রকল্প কাজে পরিণত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত **খেজুরিয়া ঘাট** থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত **নিউ জলপাইগুড়ি** পর্যন্ত একটি ব্রড গেজ রেলপথ বসানো হয়। এই রেলপথটি পূব দিকে আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত যোগীঘোপা পর্যন্ত


পশ্চিমবঙ্গ
রেলপথ
ব্রড গেজ ...
মিটার গেজ ...
ন্যারো গেজ ...
উঃ
সিকিম
ভূটান
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
যোগীঘোপা
হলদিবাড়ী
ধুবড়ী
আসাম
কাটিহার
মালদহ
খেজুরিয়াঘাট
লালগোলা
ফরাক্কা
গোমো
আসানসোল
অন্ডাল
দুর্গাপুর
আদ্রা
কাটোয়া
গেদে
রানাঘাট
বেনাপোল
বর্ধমান
ব্যাণ্ডেল
টাটানগর
কলিকাতা
ক্যানিং
খড়গপুর
বজবজ
ডায়মণ্ডহারবার
উড়িষ্যা
0 ৫০ ১০০
কিঃমিঃ

টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ ফরাক্কার কাছে গঙ্গানদীর উপর একটি কপাট বাঁধ নির্মাণ করে ঐ বাঁধের উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথ তৈরি করা হয়েছে। এই দুইটি প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার ফলে কলকাতার সঙ্গে মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর হয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচ-বিহারের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

দুর্গাপুরে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হওয়ায়, ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানারকম খনিজদ্রব্য সহজে ও তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। দুর্গাপুরের সঙ্গে রেলপথে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। উড়িষ্যা ও বিহারের সিংভূম জেলা থেকে সহজে আকরিক লোহা আনার জন্য নতুন একটা রেলপথ বসানোর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং দুর্গাপুর থেকে আদ্রার ভিতর দিয়ে লৌহখনি অঞ্চল পর্যন্ত একটি রেলপথ বসানোর প্রকল্প তৈরি করা হয়। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। বারাসত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত একটা রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে। হলদিয়ায় কলকাতার পরিপূরক বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। এই বন্দরের সঙ্গে পশ্চাদভূমির যোগসাধনের জন্য হাওড়া থেকে খড়গপুরের দিকে যে রেলপথ গেছে, পাঁশকুড়ার কাছে সেই রেলপথ থেকে একটা শাখা বের করে হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভাল জাতের কয়লার খরচ বাঁচানো এবং দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে রেলগাড়ী চালানোর জন্য স্বাধীনতা অর্জনের পর রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের এক বিরাট প্রকল্প রচনা করা হয়। এই প্রকল্প অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। আজকাল কলকাতা ও হাওড়ার সহরতলীতে প্রায় সমস্ত যাত্রীগাড়ী বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। বৈদ্যুতিকরণের ফলে কলকাতা বন্দরে এবং কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল ও দুর্গাপুরে অবস্থিত শিল্পগুলিতে মালপত্র আনা-নেওয়া করার কাজ অনেক সহজ হয়েছে।

কলকাতার রাস্তায় ভীড়ের চাপ কমানোর জন্য সম্প্রতি এই শহরের ভূগর্ভে রেলপথ নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ চলছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে এবং এই রাজ্য

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে রেলপথের দ্বারা ভালভাবে যুক্ত। হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত **হাওড়া স্টেশন** থেকে রেলপথে ভারতের যে কোন প্রান্তে যাওয়া যায়। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভারতের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে রেলগাড়ীতে চেপে হাওড়া স্টেশনে এসে নামছে এবং সেখান থেকে হাওড়া সেতুর উপর দিয়ে হুগলী নদী পার হয়ে কলকাতা শহরে ঢুকছে। **শিয়ালদহ স্টেশনটিও** দিবারাত্রি যাত্রীসমাগমে গমগম করে।

পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর কলকাতায় অবস্থিত।

আকাশপথ—সমস্ত রকমের যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে আকাশপথেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়। তবে, আকাশপথ সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল। স্বাধীনতা অর্জনের পর গত ২৭ বছরে সমগ্র ভারতের সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যেও আকাশপথে পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে। কলকাতার উপকন্ঠে **দম্‌দম্ বিমান বন্দরটি** সম্প্রসারণ করে একটি সুবৃহৎ ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত করা হয়েছে। আজকাল দমদম থেকে বিমানে করে ভারতের যে কোন প্রান্তে এবং পৃথিবীর যে কোন বড় শহরে যাতায়াত করা যায়। অনেকগুলি আন্তর্জাতিক বিমানপথ দমদমের ভিতর দিয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস্ কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর কলকাতায় অবস্থিত। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরায় এবং বর্ধমান জেলার পানাগড়ে বিমানবন্দর আছে। দমদম থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত নিয়মিত বিমান চলাচল করে।

জলপথ—সব রকম যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে জলপথ সবচেয়ে সস্তা। বিশেষ করে ভারী ও কম দামের মালপত্র পরিবহণের জন্য জলপথ অত্যন্ত উপযোগী। অবশ্য, রাজপথ, রেলপথ ও আকাশপথের তুলনায় জলপথে যানবাহন অনেক আস্তে চলে। যেখানে মালপত্র তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়ার কোন তাগিদ নেই, কিন্তু অল্প খরচে নিয়ে যেতে হবে, সেখানে জলপথই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

এক সময়ে জলপথই ছিল এদেশে যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। রাজপথ ও রেলপথের বিস্তারের ফলে নদী, খাল প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ জল-

পথের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে কমে গেছে। তাছাড়া পলি পড়ে এই রাজ্যের অনেক নদীগর্ভ ভরাট হওয়ায় সেইসব নদী যাতায়াতের পথ হিসাবে অকেজো হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৩ হাজার কি.মি. দীর্ঘ নদী ও খাল নৌচলাচলের উপযোগী। কিন্তু এই পথের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় না। আগে ভাগীরথী ও গঙ্গানদীর ভিতর দিয়ে কলকাতা থেকে সরাসরি বিহার ও উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত যাত্রী ও মাল চলাচল করতে পারত। কিন্তু ভাগীরথী নদীতে জল কমে যাওয়ায় এবং এই নদীটি বছরে ৬ মাস গঙ্গানদী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকায় জলপথে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্য **ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প** রচনা করা হয়। এই প্রকল্পের ফলে ভাগীরথী-হুগলীতে জলের পরিমাণ বাড়বে। তার ফলে, একদিকে যেমন কলকাতা বন্দরে সব সময় বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতে পারবে, অন্যদিকে তেমনি কলকাতা থেকে নদীপথে বিহার ও উত্তর-প্রদেশে যাত্রী ও মাল চলাচল করতে পারবে। এই প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পিয়ালী দক্ষিণবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। এই নদীটি প্রায় মজে গিয়েছিল। **সোনারপুর-আরাপাঁচ প্রকল্প** অনুযায়ী কাজের ফলে এই নদীটি আবার নৌ-চলাচলের উপযোগী হয়েছে।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প অনুযায়ী দুর্গাপুরে দামোদর নদের বাঁ তীর থেকে ১৩৬ কি.মি. দীর্ঘ একটি খাল কেটে হুগলী নদী পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। পরিকল্পনা ছিল, এই খালপথে আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লা সহজে ও সস্তায় কলকাতার শিল্পাঞ্চলে আসবে। এখনও পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে নদীপথে পরিবহণ দেশবিভাগের ফলে নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। নদীপথে ব্যবহৃত জলযানগুলি যে কারখানায় মেরামত করা হত, সেই কারখানাটি পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ সালে একটি **ডকইয়ার্ড** নির্মাণ করা হয়। আভ্যন্তরীণ জলপথে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই

ছিল পূর্ববঙ্গের লোক। এই কাজে ভারতীয় কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ১৯৫০ সালে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। এছাড়া এই রাজ্যে আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কারিগরী সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংস্থা হুগলী নদীতে সরকারী পরিচালনায় যাত্রী পারাপার, সুন্দরবন এলাকার জন্য জলযান সংগ্রহ প্রভৃতি অনেক প্রস্তাব দিয়েছেন।

৪

শিল্প

ভারতের শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। ভারতের মধ্যে এই রাজ্যেই সর্বপ্রথম আধুনিক বৃহদাকার শিল্পকারখানার পত্তন হয়। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কলকাতাই সমগ্র দেশের পথপ্রদর্শক। নানা-রকম সুযোগ-সুবিধা এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনে সাহায্য করেছে। ঐসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কলকাতা বন্দর অন্যতম। এই বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও মালমশলা আমদানির এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির সুযোগ এই রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করেছে। কলকারখানা চালানোর জন্য শক্তি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এই শক্তি সংগ্রহ করা হয় প্রধানতঃ কয়লা থেকে। এই রাজ্যে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি থেকে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় বলে শিল্পে শক্তির কোন অভাব হয় না। ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সূচনা হয়েছিল বৃটিশ বণিকদের উদ্যম ও মূলধনের সাহায্যে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। কলকাতা ও তার আশেপাশেই প্রথম বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলকাতাই ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। এইসব কারণে, এখানেই বৃটিশ বণিকরা মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ক্রমে, মাড়োয়াড়ি, গুজরাটি প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের বণিক সম্প্রদায় এখানে এসে মূলধন বিনিয়োগ করেছে। ভারতের মধ্যে এই রাজ্যেই প্রথম ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় শিল্পে

মূলধনের কখনও অভাব হয়নি। এই রাজ্যে পরিবহনের সুবিধা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রচুর সরবরাহ, শিল্পজাত দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা এবং মৃদু জলবায়ু শিল্পোন্নতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বড় বড় কারখানা এবং ছোট ও কুটির শিল্প, এই দু'রকমই আছে। বড় শিল্পের মধ্যে পাট শিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প, চা শিল্প ও কয়লাখনি শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের বড় শিল্পগুলিতে ১০ লক্ষ লোক কাজ করে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে শিল্পগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণ হিসাবে পাট শিল্পের নাম করা যেতে পারে। পাট শিল্প এই রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিল্প। পাটের কলগুলি কলকাতার চারপাশে হুগলী নদীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের আগে পাটকলগুলিতে যে কাঁচাপাট ব্যবহার করা হত তার বেশীর ভাগই আসত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে। দেশবিভাগের ফলে কাঁচাপাট উৎপাদক ঐ জেলাগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এই রাজ্যের পাটকলগুলিতে কাঁচাপাটের অভাব দেখা দেয়। ফলে, পাটশিল্প সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। পাটশিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পও দেশ-বিভাগের কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশবিভাগের ফলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি টুকরো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। ফলে, এখানকার যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই রাজ্যের শিল্পের বাজারের একটা অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হাতছাড়া হয়ে যায়। আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্য-গুলির সাথে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

এই রকম পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা অর্জনের পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম কাজ হয় দেশবিভাগজনিত অসুবিধা দূর করে রাজ্যের শিল্পগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং তারপর বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করা। ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত, আশানুরূপ না হলেও, এ রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি ঘটেছে। নীচে এ সম্পর্কে একটা হিসাব দেওয়া হল ঃ

সাল	কারখানার সংখ্যা	কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৪৭	১৯৬৮	৬,৬৮,০০০
১৯৫১	২৬১৩	৬,৫৫,০০০
১৯৫৬	৩১৭১	৬,৬৫,০০০
১৯৬১	৪৩১১	৭,১৮,০০০
১৯৬৫	৫৬৪৩	৮,৮০,০০০
১৯৬৬	৫৭১৪	৮,৪০,০০০
১৯৬৯	৫৫৯৯	৭,৯১,০০০
১৯৭০	৫৬১২	৮,০৯,০০০
১৯৭১	৫৫৭৭	৮,০৮,০০০
১৯৭২	—	৮,৩১,০০০

পাটশিল্প

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলির মধ্যে পাটশিল্প সবচেয়ে বড়। ভারতের মধ্যে এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী-সংখ্যক পাটের কল দেখা যায়। পাটকল-গুলি কলকাতা শহরের চারদিকে হুগলী নদীর দুই তীরে অবস্থিত। বালি, শ্রীরামপুর, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, রিষড়া, শ্যামনগর, নৈহাটি, জগদ্দল, কামারহাটি, বরাহনগর, বেলেঘাটা, বজবজ, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পাটশিল্প কেন্দ্র। ভালজাতের কাঁচাপাট উৎপাদক অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান, অদূরবর্তী রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনি থেকে কয়লা আনার সুবিধা, কলকাতা বন্দর, বৃটিশ মূলধন ও উদ্যোগ এবং এই রাজ্য ও প্রতিবেশী বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রচুর, সুলভ, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ হুগলী নদীর দুই তীরে পাটশিল্পের একদেশীভবনে সাহায্য করেছে।

এই রাজ্যের পাটকলগুলিতে চট, থলে, ত্রিপল, কার্পেট, লাইনোলিয়াম, দড়াদড়ি প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। এইসব জিনিসের অধিকাংশ কলকাতা বন্দর থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আমরা বছরে গড়ে ২০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করে থাকি। ১৯৪৭

সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের ক্রমবিকাশের একটা পরিচয় নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

সাল	পাটকলের সংখ্যা	পাটকলে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা	উৎপাদন (টন)
১৯৪৭	৯৮	২,৯৯,০০০	১০,২৬,০০০
১৯৫১	৯৮	২,৬১,০০০	৮,৮৮,১০০
১৯৫৬	১০১	২,৫৪,০০০	১১,১০,৩০০
১৯৬১	৮২	২,০৮,০০০	৯,৭০,৩০০
১৯৬৬	৭৭	২,৩০,০০০	১১,১৯,৫০০
১৯৭১	৫৪	২,১৯,০০০	১০,৮৭,০০০
১৯৭২	—	—	১১,১০,০০০

গত ২৭ বছরে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা কাঁচাপাট উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে। পাটকলগুলিতে পুরোনো সেকেলে যন্ত্রপাতি পাল্টে আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। পাটের কলে চট, থলে প্রভৃতি গতানুগতিক জিনিস উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের জিনিস তৈরির দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।

লোহা ও ইস্পাত শিল্প

সব রকম শিল্পের মধ্যে লোহা ও ইস্পাত শিল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম আধুনিক বড় লোহার কারখানা স্থাপিত হয়। লোহা ও ইস্পাত শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এই রাজ্যে আছে। ১৯৪৭ সালের আগে এখানে একটি মাত্র লোহা ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র ছিল। ঐ কেন্দ্রটি বার্ণপুরে অবস্থিত। স্বাধীনতা অর্জনের পর বিভিন্ন পর্যায়ে ঐ কেন্দ্রটির সম্প্রসারণ ক'রে উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১০ লক্ষ টন করা হয়েছে। বর্তমানে বার্ণপুরের ইস্পাতশিল্প সরকারী পরিচালনাধীনে আনা হয়েছে।

লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে সরকারী উদ্যোগ ও মালিকানায় ভারতে তিনটি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা গড়ে তোলা হয়। তারমধ্যে একটি স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। গ্রেট বৃটেনের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় দুর্গাপুরের কারখানাটি নির্মাণ করা হয়েছে। নিকটবর্তী রাণীগঞ্জের কয়লাখনি থেকে কয়লা, সিংভূম থেকে আকরিক লোহা এবং বীরমিত্রপুর থেকে চুনাপাথর এনে এখানে লোহা ও ইস্পাত তৈরি হয়। যাতায়াতের দিক দিয়ে দুর্গাপুরের অবস্থান অত্যন্ত সুন্দর। এই শহরের ভিতর দিয়ে পূর্ব রেলপথ এবং পাশ দিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে। শহরের কোল ঘেসে দামোদর নদ প্রবাহিত। এই নদের জল এবং এই নদের উপত্যকায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ এখানে শিল্প স্থাপনে সাহায্য করেছে। এখান থেকে ১৬০ কি.মি. পূবে কলকাতার বন্দর ও বাজার অবস্থিত। পশ্চিমে প্রায় গা ঘেসে রয়েছে আসানসোল, সিন্ধ্রি, চিত্তরঞ্জন ও রূপনারায়ণপুরের কারখানাগুলি। ফলে, দুর্গাপুরের কারখানায় উৎপাদিত লোহা ও ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা। বার্ণপুরের মত এখানেও শ্রমিকের সরবরাহ প্রচুর। ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করে বর্তমানে এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ টন ইস্পাত ও ৩ লক্ষ টন কাঁচা লোহা।

লোহার সঙ্গে নানারকম ধাতু মিশিয়ে মিশ্র ইস্পাত তৈরি করা হয়। ১৯৬৩ সালে দুর্গাপুরে সরকারী মালিকানায় এই রকম **মিশ্র ইস্পাত** তৈরির একটা কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। প্রথমে এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বছরে ৪৮,০০০ টন ইস্পাত। পরে ঐ ক্ষমতা বাড়িয়ে ৬০,০০০ টন করা হয়। বর্তমানে এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। বেসরকারী মালিকানায় হাওড়ায় গেস্ট কীন উইলিয়ামস লিমিটেডের একটি মিশ্র ইস্পাত তৈরির কারখানা আছে। ঐ কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে মাত্র ৬,০০০ টন। সরকারী ও বেসরকারী মালিকানার সমবায়ে পুরুলিয়া জেলায় বছরে ৩৬,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মিশ্র ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার আমল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত উৎপাদনের একটা চিত্র নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

সাল	পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন (টন)	ভারতের উৎপাদন (টন)	ভারতের উৎপাদনের শতকরা কতভাগ পশ্চিমবঙ্গে হয়
১৯৫১	২,৩৫,২০০	১০,৯৪,০০০	২১.৫%
১৯৫৬	৪,১৩,৯০০	১৩,৫৯,০০০	৩০.৪%
১৯৬১	৮,৮০,৩০০	২৮,৪৫,০০০	৩০.৯%
১৯৬৬	১১,৯১,৩০০	৪৪,৭২,০০০	২৬.৬%
১৯৭০	১০,০৭,০০০	৪৮,২৭,৪০০	২০.৯%
১৯৭১	১০,১০,০০০	৪৪,৮০,০০০	২২.৫%

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

এই রাজ্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে এই শিল্পের সূচনা হলেও, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গত ২৭ বছরে এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য তৈরির জন্য যেমন বড় বড় কারখানা আছে, তেমনি আছে অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা। এই রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পে মোট যত টাকার জিনিস উৎপাদিত হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে হয় তার শতকরা ২৭ ভাগ। তাছাড়া এই রাজ্যের সব শিল্পে মোট যত লোক কাজ করে একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে করে তার শতকরা ৩০ ভাগ। এই রাজ্যের বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে রেল ইঞ্জিন শিল্প, মোটরগাড়ী শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ওয়াগন শিল্প, সেলাইকল ও বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের মালিকানায় বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানাটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই কারখানায় বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল ইঞ্জিনও তৈরি করা হচ্ছে। এই কারখানায় বছরে ৩০০টি ইঞ্জিন তৈরি হতে পারে। কলকাতার কাছে কোন্নগরে একটি মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা আছে। ১৯৪৮ সাল থেকে হিন্দ্ মোটরস্-

এর এই কারখানায় মোটরগাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৯৭১ সালে এখানে ২৭ হাজার ২শ' ২৪টি গাড়ি তৈরি হয়েছিল।

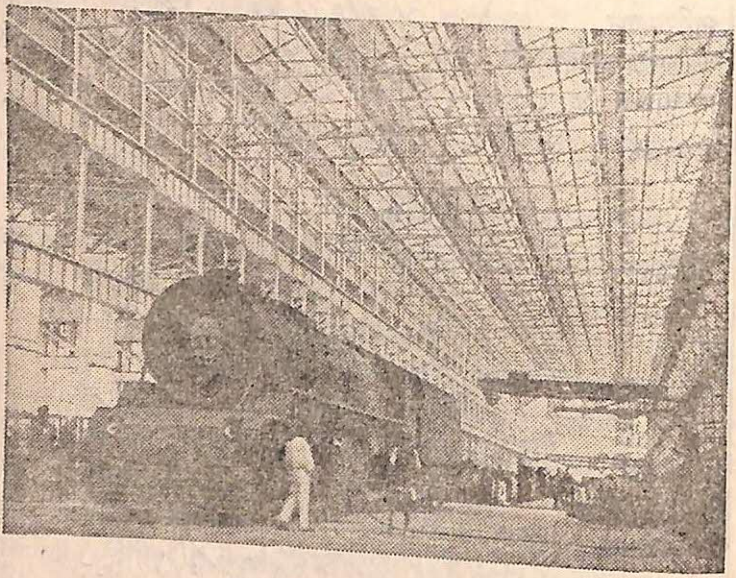
স্বাধীনতা লাভের পর থেকে যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ প্রভূত উন্নতি করেছে। কলকাতার কাছে বেলঘরিয়া-আগরপাড়া অঞ্চলে টেক্সম্যাকোর কারখানায় বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হচ্ছে। যাদবপুরে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি কারখানা আছে। দুর্গাপুরে কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি বিরাট কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ায় যন্ত্রপাতি মেরামত ও যন্ত্রপাতির অংশ তৈরির জন্য বহু ছোট ও মাঝারি আকারের কারখানা আছে।

কলকাতার গার্ডেনরীচে ছোট ছোট জাহাজ, ষ্টীমার ও অন্যান্য ধরনের জলযান নির্মাণের একটি কারখানা আছে। গত ২৫ বছরে এই কারখানাটিকে অনেক বড় করা হয়েছে। রূপনারায়ণপুরে কেব্‌ল্, আসানসোলে বাইসাইকেল, দমদমে ও বার্ণপুরে রেলের ওয়াগন ও ট্রামগাড়ী, কলকাতার চারপাশে সেলাইকল, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, গ্রামোফোন, বৈদ্যুতিক বাল্ব, রেফ্রিজিরেটর প্রভৃতি তৈরী হয়। কাঁচড়াপাড়া ও খড়গপুরে দুইটি বড় রেলের মেরামতি কারখানা আছে। সমগ্র ভারতে মোট যত বৈদ্যুতিক পাখা তৈরী হয় পশ্চিমবঙ্গে হয় তার শতকরা ৪৮ ভাগ। সমগ্র ভারতের রেল ওয়াগন উৎপাদনের শতকরা ৫৬ ভাগ এবং সেলাইকলের শতকরা ৭২ ভাগ এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রশিল্প, রাসায়নিক ও ওষুধ প্রস্তুত শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কাগজ শিল্প, কাচ শিল্প, চামড়া শিল্প, বেকারি শিল্প প্রভৃতিও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে এই রাজ্যে দুর্গাপুরে একটি বড় রাসায়নিক কারখানা, সার নির্মাণের কারখানা ও একটি কোক তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে। হলদিয়ায় একটি নতুন বন্দর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে একটি তৈল শোধনাগার ও সারের কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি নানাকারণে এই রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা মন্দার ভাব দেখা দিলেও এখানে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এই রাজ্যে শিল্পোন্নতির গতি ত্বরান্বিত করবার জন্য সরকার কতকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

হয়েছে। রেলপথ ও রাজপথের দ্বারা এই অঞ্চলটি কলকাতা বন্দর ও দেশের অন্যান্য অংশের সাথে ভালভাবে যুক্ত। এই সব কারণে এই অঞ্চলে শিল্পোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম জার্মানীর রূর নদীর



চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন কারখানা

উপত্যকায় কয়লা সম্পদের উপর ভিত্তি করে যেমন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, আসানসোল-দুর্গাপুর, তথা সমগ্র দামোদর উপত্যকায়, কয়লা সম্পদের উপর ভিত্তি করে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

মাত্র দুইটি অঞ্চলে শিল্পোন্নতি সীমাবদ্ধ থাকায় রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরোক্ত দুইটি অঞ্চল ছাড়া নিম্নলিখিত আরও ৬টি অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রকল্প রচনা করেছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ চলছে ঃ

(১) কল্যাণী—এই উপনগরীটি কলকাতার কাছে নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানে শিল্প স্থাপনে সরকার নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন।

১৯৬০ সালে সরকারী মালিকানায় এখানে একটি সূতাকল স্থাপিত হয়। এখানকার শিল্প এস্টেটে অনেকগুলি মাঝারি ও ছোট শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। ঐসব কারখানায় বাইসাইকেলের অংশ, ইস্পাতের নল, গ্রীল, প্যাকিং বাক্স, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, খেলনা, ইস্পাতের আসবাব-পত্র, বৈদ্যুতিক সামগ্রী প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানে বেসরকারী বহু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান আকৃষ্ট হয়েছে।

(২) **হলদিয়া**—কলকাতা থেকে ৯০ কি.মি. দক্ষিণে হুগলী নদী ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে কলকাতা বন্দরের পরিপূরক একটি বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে একটি বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পস্থাপনের সুবিধার জন্য হলদিয়াকে রেলপথ ও রাজপথের দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। জমি ও বিদ্যুৎ সরবরাহেরও ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এখানে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই শোধনাগার থেকে উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে ন্যাপথা পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে এখানে সারের কারখানা ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প স্থাপন করা যাবে। সারের কারখানা বসানোর কাজ চলছে। এখানে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছে এবং একটি সোডা এ্যাশ-এর কারখানা স্থাপিত হয়েছে। হলদিয়ায় শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড গঠন করেছেন।

(৩) **সাঁওতালদি-রামকানালি**—এই অঞ্চলটি পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত। সাঁওতালদিতে একটি বড় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। জামসেদপুর, রাউরকেলা, বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানাগুলি এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। নানারকম খনিজ সম্পদ কাছাকাছি জায়গাগুলিতে পাওয়া যায়। ঝালদায় প্রচুর চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পুরুলিয়ায় একটি সিমেন্টের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করছেন। এখানে একটি মিশ্র ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

খড়গপুর—এই শহরটি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে একটি বড় রেলের মেরামতি কারখানা আছে। রেলপথের দ্বারা এই শহরটি


পশ্চিমবঙ্গ
শিল্পাঞ্চল
কিলোমিটার
0 ১৫ ৩০
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
ফারাক্কা
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
আসানসোল
দুর্গাপুর
সাঁওতালদি
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
নদীয়া
কল্যাণী
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
খড়গপুর
হলদিয়া
চব্বিশ পরগনা
ব ঙ্গো প সা গ র

কলকাতা ও আসানসোলের সাথে যুক্ত। এখানে নানারকম শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা আছে।

ফরাক্কা—মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এই জায়গাটি অবস্থিত। এখানে গঙ্গার উপর একটি কপাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে ফরাক্কার অবস্থান অত্যন্ত সুবিধাজনক। উত্তর ও দক্ষিণ-বঙ্গের সংযোগস্থলে এই জায়গাটি অবস্থিত। ৩৪নং জাতীয় সড়ক এখান দিয়ে গেছে। ফরাক্কা বাঁধের উপর দিয়ে রেলপথ স্থাপন করে উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগসাধন করা হয়েছে। এখানে জলপথে যাতায়াতেরও সুবিধা আছে। এখানে নানাবিধ শিল্প স্থাপনে সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন।

শিলিগুড়ি—এই জায়গাটি দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ৩১নং এবং ৩১(ক) নং জাতীয় সড়ক শিলিগুড়ির ভিতর দিয়ে গেছে। এই সড়ক দুইটি আসাম ও সিকিমকে অবশিষ্ট ভারতের সাথে যুক্ত করেছে। এখান থেকে নেপাল ও ভুটানে যাওয়ার রাস্তাও আছে। এখানে সরকারী মালিকানায় একটি করাতকল ও কাষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র আছে। বেসরকারী মালিকানায় সাবান ও মোমবাতি তৈরীর কারখানা, বেকারী, করাতকল, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈরীর কারখানা, বালতি তৈরীর কারখানা, চালকল, ময়দাকল, প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। সশৃঙ্খলভাবে শিল্পোন্নতি ও এই শহরের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার শিলিগুড়ি প্লানিং অর্গানাইজেশন গঠন করেছেন। বিদ্যুৎশক্তির ব্যবস্থা করা গেলে বনজ সম্পদ এবং পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য সম্পদের উপর নির্ভর করে এখানে একটি বড় শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা যেতে পারে।

কুটির শিল্প—এই রাজ্যে অনেক বড় বড় শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হলেও ছোট ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব কম নয়। বেকার সমস্যার সমাধানে, গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে এবং নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্য-দ্রব্য উৎপাদনে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

কুটির শিল্পের এই গুরুত্বের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা-কালে নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন :—

(১) কাঁচা মাল সরবরাহ—কুটির শিল্পের জন্য এমন অনেক কাঁচা মাল প্রয়োজন যেগুলো দেশের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না।

অনেক কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এই রকম দুষ্প্রাপ্য দেশী ও আমদানি করা বিদেশী কাঁচামাল কুটির শিল্পগুলিকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

(২) কুটির শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের কারিগরী পরামর্শ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির উপযোগিতা বোঝানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

(৩) উৎপাদনের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

(৪) সারা রাজ্যে সরকার ৭টি শিল্প উপযোগী এলাকা গঠন করেছেন।

(৫) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মূলধন যোগানোর জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৬) ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরী জিনিসের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও রাজ্য ভিত্তিক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য বিভিন্ন সরকারী বিপণন বিভাগের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

(৭) ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরী জিনিসের মান বজায় রাখার জন্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য মান নির্ধারণ ও চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই রাজ্যে শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য **১৬ দফা কর্মসূচী** গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৪৯২টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এইসব ইউনিটে ৯৬১১ জন কাজ পেয়েছে। ছোট শিল্পগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য **পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড** গঠন করা হয়েছে।

এই রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতশিল্প প্রধান। ১৯৫০-৫১ সালে এই রাজ্যে তাঁতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষের মত। বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। তাঁতজাত বস্ত্রের উৎপাদন ২০ কোটি গজ। ভারত সরকারের সাহায্যে এ রাজ্যে ১০০টি সমবায় সমিতি স্থাপন করে ১৬০০টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বসানো হয়েছে। এই তাঁতগুলির দ্বারা বছরে ৪½ কোটি গজ কাপড় তৈরী হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যে ৬০০০টি নতুন বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বসাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই রাজ্যের অন্যান্য কুটির শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প, চামড়া শিল্প, লাক্ষা শিল্প, নারকেল ছোবড়াজাত বিভিন্ন জিনিস তৈরী শিল্প, মোষের শিং দিয়ে তৈরী জিনিস, কাঠের ঘোড়া, শামুকের খোলার তৈরী জিনিস, মাদুর শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, তেলের ঘানি, বিড়ি শিল্প, গুড় শিল্প, আসবাব-পত্র তৈরী শিল্প, ধান ভানা, কামারশালা, মিষ্টান্ন শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য দুই রকমের হতে পারে। একই দেশের দুইটি অঞ্চলের মধ্যে মালপত্র আদান-প্রদান হলে তাঁকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের মালপত্র বেচাকেনা হলে তাকে বলে বহির্বাণিজ্য। বিদেশ থেকে মাল কিনে আনাকে বলে **আমদানি** এবং বিদেশের কাছে মাল বিক্রি করাকে বলে **রপ্তানি**।

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে বিশেষভাবে উন্নত। এই রাজ্যে অবস্থিত কলকাতা বন্দর ভারতের প্রধান বন্দরগুলির অন্যতম। এক সময়ে কলকাতা বন্দর ছিল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বন্দরের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হত। কিন্তু নানাকারণে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে কমে গেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত থেকে মোট যত টাকার মাল রপ্তানি হয়েছিল, এক কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে হয়েছিল তার শতকরা ৬০ ভাগ। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে ভারতের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে হয়েছিল। আমদানির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ১৯৪৭-৪৮ সালে দেশের মোট আমদানির শতকরা ২৮ ভাগ কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে আমদানি বাণিজ্যে কলকাতার অংশ কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ।

দেশবিভাগ, অন্যান্য বন্দরের কার্যকলাপ বৃদ্ধি, নতুন বন্দর গঠন প্রভৃতি নানা কারণ কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব হ্রাসের পিছনে রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় হুগলী নদীর নাব্যতা হ্রাস।

বঙ্গোপসাগর থেকে ১২৮ কি.মি. দূরে হুগলী নদীর তীরে কলকাতা বন্দর অবস্থিত। গঙ্গার মূল জলস্রোত পদ্মানদীর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় ভাগীরথী-হুগলীতে জলের স্রোত কমে গেছে। দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী যে পলি হুগলী নদীতে এনে জমা করে, স্রোতের বেগ কম থাকায় তা পুরাপুরিভাবে সমুদ্রে চলে যেতে পারে না ; নদী গর্ভে জমা হতে থাকে। এইভাবে হুগলী নদীতে চড়া পড়ছে এবং নদীগর্ভ অগভীর হয়ে পড়ছে। আজকাল ৬-৭ মিটারের বেশী গভীর খোলের জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসতে পারে না। বন্দরে বড় জাহাজগুলি পুরোপুরি বোঝাই করাও সম্ভব হয় না। সমুদ্র থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত আসার পথে অনেক সময় জাহাজ চড়ায় আটকে যায়। নদীতে জল কম থাকায় সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে বন্দরে ঢোকা এবং বন্দর থেকে সমুদ্রে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জোয়ারের অপেক্ষায় থাকতে হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ড্রেজারের সাহায্যে নদীগর্ভের পলি কেটে জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখতে হয়। এছাড়া কলকাতা বন্দরে যাতায়াতকারী জাহাজগুলি যাতে চড়ায় আটকে না যায় সেজন্য হুগলী নদীর মধ্যে সুদক্ষ পাইলটের সাহায্যে জাহাজগুলি চালানো হয়। এই ভাবে কলকাতা বন্দর অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে এবং কাজকর্ম কমে যাচ্ছে।

এই সমস্যার সমাধান করে কলকাতা বন্দর এবং পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ঃ **(১) হলদিয়ায় পরিপূরক বন্দর নির্মাণ, (২) ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ।** কলকাতা থেকে ৯০ কি.মি. ভাটিতে হুগলী নদী ও হলদি নদীর সঙ্গমস্থলে হলদিয়ায় একটি নতুন বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে এই বন্দরে ৭টি বার্থ নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে একটি খনিজ তেল নামানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরী হচ্ছে। একটি শাখা রেলপথের দ্বারা হলদিয়াকে দ.পূ. রেলপথের দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাই সড়কের সঙ্গে এই বন্দরকে যুক্ত করার জন্য ৪১ নং জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। বন্দরের সঙ্গে সন্নিহিত শহর ও শিল্প সংস্থাগুলির যোগাযোগের জন্য আভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হলদিয়া বন্দর পুরাপুরিভাবে চালু হলে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ফরাক্কার কাছে গঙ্গার উপর একটি কপাট বাঁধ নির্মাণ করে এই নদীর জলস্রোতের একটা অংশ ভাগীরথীর মধ্যে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে ভাগীরথী-হুগলীতে জলস্রোত বাড়বে ও পলি পড়া কমবে। ফলে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত আসতে পারবে, বন্দরের খরচ কমবে এবং বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই বাঁধের উপর দিয়ে যে রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে তার ফলে কলকাতা বন্দর সমেত দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির যোগাযোগ সহজ হয়েছে। এর ফলেও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

উত্তর দাও

১. পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর।
২. এই রাজ্যে কত রকম জলসেচ ব্যবস্থা দেখা যায়?
৩. স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এই রাজ্যে নলকূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা কতটা প্রসার লাভ করেছে?
৪. বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কাকে বলে? পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি বহুমুখী নদী প্রকল্পের রূপ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোন্‌টি?
৫. ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জান লেখ।
৬. এই রাজ্যে মাঝে মাঝে খরা ও বন্যা হওয়ার মূল কারণ কি?
৭. স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি কাজ করা হয়েছে?
৮. পশ্চিমবঙ্গের ২টি জল নিষ্কাশন প্রকল্পের নাম কর।
৯. যাতায়াত ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। এই রাজ্যের ভিতর দিয়ে যেসব জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলির বর্ণনা দাও।
১০. স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত যে কয়টি রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি বর্ণনা দাও।

১১. পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র এঁকে রেলপথগুলি দেখাও।

১২. জলপথের সবিধা ও অসুবিধা কি কি? এই রাজ্যে আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

১৩. ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এই রাজ্যে কলকারখানার কতটা উন্নতি হয়েছে তার একটা হিসাব দাও।

১৪. পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনের পর ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি প্রকল্প কার্যকরী করা হয়েছে?

১৫. গত পঁচিশ বছরে এই রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রগতির একটি বিবরণ দাও।

১৬. কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চলে কোন কোন শিল্প স্থাপিত হয়েছে?

১৭. কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল ছাড়া এই রাজ্যে আর কোথায় কোথায় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে?

১৮. খুব ছোট করে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে লেখ।

১৯. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

২০. এই রাজ্যের পাঁচটি প্রধান কুটির শিল্পের নাম কর।

২১. কলকাতা বন্দর তথা পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যেসব প্রকল্প অনুযায়ী কাজ চলছে সেগুলির বর্ণনা দাও।
